জোবাইদা নাসরীন : জন্ম ২২ আগস্ট ১৯৭৬, কুমিল্লায়। কৈশোর কেটেছে নোয়াখালীর মাইজদীতে। সেখানেই স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে ঢাকায় আসা। তাঁর পরের শিক্ষা ঢাকার বেগম বদরুন্নেসা কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে কর্মরত আছেন রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ্স নামক একটি গবেষণা- সহায়ক প্রতিষ্ঠানে। এর বাইরে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করছেন রয়্যাল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকায়।

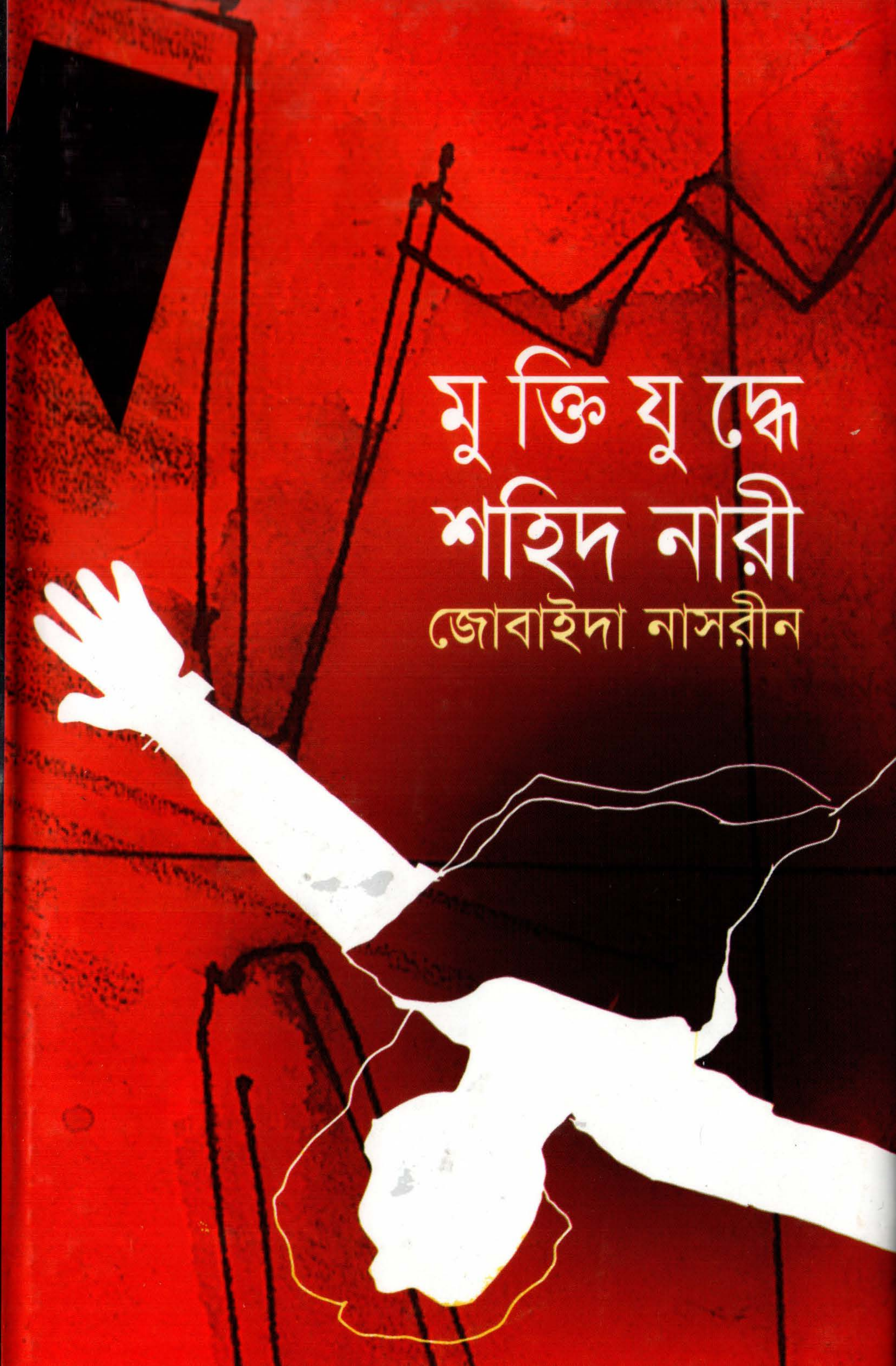
নৃবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে সমাজ, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির সম্পর্ককে দেখার এক দুর্দমনীয় আগ্রহ দ্বারা বরাবরই পরিচালিত হয়েছেন। দেখা এবং লেখার বিষয় ইতিহাস নির্মাণের রাজনীতি, বঞ্চিত বিশ্বের নারীর লড়াই এবং সংখ্যালঘুর সংগ্রাম। 'মুক্তিযুদ্ধে শহিদ নারী'–এই অনুসন্ধিৎসারই ফসল।

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই :

মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী ২০০৭, মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য নারী ২০০৭, নিজভূমে পরবাসী সহ লেখক ২০০০, পথিকৃৎ আদিবাসী নারী ২০০৭।

ISBN 984 70152 0021 3

মুক্তিযুদ্ধে শহিদ নারী | জোবাইদা নাসরীন



মুক্তিযুদ্ধে শহিদ নারী

জোবাইদা নাসরীন

মুক্তিযুদ্ধে শহিদ নারী

(ইতিহাসে নারীর অগ্রন্থিত বয়ান)

জোবাইদা নাসরীন

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

কম্পোজ
সূচনা কম্পিউটার্স
৪০/৪১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
১২০·০০ টাকা

ISBN 984-70152-0021-0

MUKTIJUDDHE SAHID NARI (Women Martyred in Liberation War)
by Zobaida Nasreen
Published by Milan Nath. Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
e-mail milonnath@gmail.com

Price Tk. 120.00 US$ 5.00 Only.

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই সম্ভবত বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছিল। বিভিন্নভাবে এই যুদ্ধের ইতিহাস রচিত ও নির্মিত হলেও তাতে উপেক্ষা করা হয়েছে সমাজের অর্ধেকাংশের ভূমিকা অর্থাৎ উপেক্ষিত হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর সঠিক অবদানের কথা।

এ বিষয়ে কারোরই কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসই জাতীয় জীবনের সর্বোচ্চ গৌরবের ইতিহাস। এই ইতিহাস নিয়ে আমাদের গর্ব আছে, অহঙ্কার আছে, আছে পূর্বসূরিদের প্রতি এই প্রজন্মের গভীর সম্মানবোধ, যাঁদের জন্য আজ তারা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। কিন্তু তারা কতটুকু জানে শহিদদের কথা? বিশেষ করে শহিদ নারীদের কথা? তাদের কতজনের ছবি তারা দেখেছে? মুক্তিযুদ্ধের ৩৬ বছর পরেও বাংলাদেশের কতজন নারী মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন, তার কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই। স্বাধীনতার পর তৈরি হওয়া শহিদদের তালিকাতেও নারীদের খুব একটা নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন জেলা শহরে শহিদদের নাম-ধামের উল্লেখ করে যেসব স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে সেখানেও স্থান পাননি কোনো নারী। দেশের বেশিরভাগ মানুষই তাই শহিদ হিসেবে তাঁদের পরিচিতি জানেন না। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে গিয়ে এই মহানযজ্ঞে নারীর ওতপ্রোত গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকেও চাপা দিয়ে কেবল বড় করে তুলে ধরা হয়েছে তাকে ধর্ষণ ও তাঁর অপমানের কথা। যতটুকু স্বীকার করা হয়েছে সেটা হলো, মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা কেবল করে, তাদেরকে রান্নাবান্না করে খাইয়ে, কিংবা তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে নারীরা মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন। অথচ এই যুদ্ধে যে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের সমান এবং তার আত্মাহুতির ব্যাপকতা যে কোনো অর্থেই পুরুষের চাইতে কম নয়, সে কথাও স্বীকার করেনি ইতিহাস। করেনি যে তার কারণ রয়েছে। কেননা, সেই ইতিহাস পুরুষের রচিত বলে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও সেই একই পক্ষপাতিত্ব। প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি কোনো নারী শহিদ হননি একাত্তরে? মুক্তিযুদ্ধ কি কেবল পুরুষেরাই করেছিল? এভাবেই ইতিহাসের একটি বিশেষ লিঙ্গীয় বোধ থেকেই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ উপস্থাপিত হয়েছে নতুন প্রজন্মের কাছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য এবং বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বহু নারী শহিদ হয়েছেন।

স্বাধীনতার প্রায় বিশ বছর পর বিংশ শতকের নয়ের দশকে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেশ কিছু বই প্রকাশিত হলেও এসবে নারী ছিলেন অনুপস্থিত। গত দশকের শেষদিক থেকে এ বিষয়ে প্রকাশিত হতে থাকে অনেক অজানা তথ্য, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ, ধরন বা প্রকৃতি এবং তার মাত্রা বা ব্যাপকতা সম্পর্কে। দেশের লোকজন তারামন বিবি, ক্যাপ্টেন সেতারা ও শোভাসহ আরও অনেক নারীর সশস্ত্র সংগ্রামের কথা জানতে পারেন। সীমিত পরিসরে হলেও এ বিষয়ে মৌখিক ইতিহাসভিত্তিক গবেষণা এবং অনুসন্ধানী কাজও হতে থাকে, যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে 'আইন ও শালিস কেন্দ্র'র উদ্যোগে প্রকাশিত '৭১-এ নারী অভিজ্ঞতা ও যুদ্ধ-পরবর্তী কথ্যকাহিনী' শীর্ষক গ্রন্থসূত্রে বিভিন্নভাবে নারীর অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। এর আগে একমাত্র শহিদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন এবং শহিদ মেহেরুন্নেসার নাম বাদে অন্য কোনো নারী শহিদের নাম সেভাবে প্রকাশ করা হয়নি অথবা আলোচনায় আসেনি।

এ বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ অর্থাৎ ইতিহাসের এই অনালোচিত বিষয়টি নিয়ে আমার আগ্রহের গভীরতাকে স্পর্শ করে একটি সেমিনারে যোগদানের ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিন একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই সেমিনারের থিম ছিল 'পলিটিক্স অব মেমোরি অ্যান্ড এমনেসিয়া'। এই সেমিনারে সোনিয়া আপা শহিদ সেলিনা পারভীনের শহিদ হওয়ার ঘটনা বিষয়ে আলোকপাত করেন। সত্যি বলতে কী, সেমিনারের পর আমাকে অধিকার করে রাখা পুরনো ভাবনাটি আমাকে আবারও আরও জোরালোভাবে জেঁকে ধরে।

আসলে আমার এই ভাবনার সূত্রপাত দীর্ঘদিন আগে। এর প্রধান উৎস হিসেবে বিশেষভাবে কাজ করেছে বাংলা একাডেমী থেকে বিভিন্ন সময়ে বের হওয়া 'স্মৃতি ১৯৭১' শীর্ষক গ্রন্থগুলো। প্রাথমিকভাবে আমি চারজন শহিদ নারীর কথা জানতে পারি এবং আমার নিজের কাজের অভিজ্ঞতা (আমি যখন 'মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালী' বিষয়ক গবেষণা সম্পৃক্ত কাজটি করি) আমাকে এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হওয়া নারীর সংখ্যা অনেক হবে।

আমার ভাবনা ক্রমশ ডালপালা মেলতে শুরু করে। আমি বিষয়টি নিয়ে আমার ঘনিষ্ঠ দু'একজনের সঙ্গে আলোচনা করি। প্রথমে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দিয়ে এগিয়ে আসেন আমার ঘনিষ্ঠ মতিয়া চৌধুরী, বজলুর রহমান এবং সোহরাব হাসান। তাঁরা তাঁদের জানামতো আরও জনা কয়েক শহিদ নারীর নাম দিয়ে আমাকে পাওয়া নামের একটি তালিকা তৈরির দিকে ঠেলে দেন। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পাওয়া তালিকা নিয়েই আমি এগোতে থাকি। কাজে নেমে জানলাম অনেক অজানা ঘটনা। অনেকেই অনেক ঘটনার বর্ণনা দিতে পেরেছেন, কিন্তু বলতে পারেননি সেই ঘটনায় শহিদ হওয়া সব নারীদের নাম। তাঁদের নাম না পাওয়ায় এবং পরিচয় কেবল তাঁদের স্বামী কিংবা সন্তানের মা হিসেবে পাওয়ায় অনেকেই তাঁদের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে পারেননি। ফলে

তাঁদের অনেকের সম্পর্কেই বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের সমস্যার পরও আমি এগিয়ে গিয়েছি আমার স্বপ্ন নিয়ে, অজানা ইতিহাস খুঁড়ে দেখার তাগিদ তাড়িত হয়।

আমার এই স্বপ্ন রূপায়ণের সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা এবং সাহসের সঞ্চারক হিসেবে রাজশাহীর অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর নির্বাহী পরিচালক শ্রদ্ধেয় সালিমা সারোয়ার।

এত কিছুকে সঙ্গী করে শুরু হলো আমার গবেষণাকর্ম। শুরু হলো শহিদ নারীদের বেঁচে থাকা আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের পালা। এদিক থেকে আমার ভাগ্য বেশ প্রসন্নই বলতে হবে। কেননা তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিভিন্নভাবে আমার পূর্ব-পরিচিত।

স্মৃতিচারণ করা এমনিতেই খুব কঠিন কাজ, বিশেষত তা যদি হয় প্রিয়জনের এবং বেদনার। তাই এত বছর পর শহিদ নারীদের ঘনিষ্ঠজনদের মুখোমুখি হওয়ার সময় আমি যেমন দেখার চেষ্টা করেছি সেই সময়কে, সাহস নিয়ে এগিয়ে গিয়েছি, তেমনি তাঁদের জন্য সেই রক্তাক্ত স্মৃতিকে টেনে তোলা ছিল আরও গভীর বেদনার। আমি তাঁদের স্মৃতির দরজায় কড়া নেড়েছি মাত্র, কিন্তু অনেকেই সেই দরজা খুলতে সময় নিয়েছেন, মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাই অন্যান্য গবেষণার মতো সময়ের হিসেব করে এটি করা যায়নি। প্রিয়জনের স্মৃতি বলতে গিয়ে কেঁদেছেন সবাই। তাঁদের সেই কান্না, গর্ব, আর দেশপ্রেমের আলোকে আমি আলোকিত হয়েছি, বুনেছি আমার স্বপ্ন। তাঁদের সেই কান্না আমাকে নত করেছে বারবার, গভীর অনুতাপ বোধ করেছি এতদিন পরে আবারও তাঁদের চোখে জল এনেছি বলে।

এই গবেষণা চলার সময় বেশ কিছু পরামর্শ এবং তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন রাজনীতিবিদ এবং অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। আমার অনুসন্ধিৎসার দরবারে তাঁদের মায়ের অনেক স্মৃতি নিয়ে হাজির হওয়ার চেষ্টা করেছেন চৌধুরী মোঃ সুমন জাহিদ, সাইদুর রহমান, অরুণচন্দ্র দে, অধীরচন্দ্র দে, প্রতিভা দে, রুবেল, মুরাদ হোসেন, রিনা মল্লিক প্রমুখ। বোন শহিদ মিলি চৌধুরীর স্মৃতিচারণ করেছেন আমার শিক্ষক কাজী তামান্না, শহিদ কবি মেহেরুন্নেসার স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর বান্ধবী হাফিজা বেগম, শহিদ লুৎফুন্নাহার হেলেনের স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর বোন মাহমুদা খাতুন রিনা, শহিদ ভ্রমর-এর স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর এক প্রতিবেশী, যশোরের প্রথম শহিদ চারুলতার তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন আম্বিয়া শফি এবং পিরোজপুরের শহিদ ভাগিরথী সাহার তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন লোপা এবং সাইফ রানা।

আসলে বয়স যতই হোক ঘনিষ্ঠজনের স্মৃতিতে কখনও জমে না কোনো ধুলো। তারই প্রমাণ মিলল অনেকের সঙ্গে কথা বলে। শহিদ ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরীর একটি হৃদয় নিংড়ানো স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর খালা অশীতিপর কানিজ ফাতেমা মোহসিনা। দিনাজপুরের তথ্য নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন ভারতী নন্দী সরকার। সৈয়দপুরে ছিলেন দীপেন্দ্র সরকার। পটুয়াখালীর শহিদ নারীদের তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন

দৈনিক 'জনকণ্ঠ'র পটুয়াখালী প্রতিনিধি শংকর লাল দাস। শহিদদের বিভিন্ন জনের ছবি পেয়েছি তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে। এর বাইরেও কিছু ছবি নেয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে। সেই ছবি তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী।

সকলের প্রতি থাকল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এর বাইরে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাঁরা হলেন সেলিনা হোসেন, ড. হামিদা হোসেন, রেহনুমা আহমেদ, ড. মেঘনা গুহ ঠাকুরতা। ঘনিষ্ঠরা চিরকালই কৃতজ্ঞতার অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিবাদন।

আমার অফিসের সহকর্মী রানা, সাইফ, অশোক, রাশিদা, মামুন, সুবর্ণা, নাছিমা, সুরাইয়া বেগম এবং ড. কোরবান আলী বিভিন্ন সময় আমার গবেষণাকাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আমার কাজের গতিকে বাড়াতে সহায়তা করেছেন। সকলের কাছেই আমি কম-বেশি ঋণী। বিশেষ কৃতজ্ঞতা আখতার হুসেন এবং মোর্শেদ শফিউল হাসানের প্রতি। অনুপম প্রকাশনীর মিলন নাথের প্রতিও রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এই গবেষণা গ্রন্থে পঁচিশ জন শহিদ নারী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এই গবেষণাভিত্তিক বইটি মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নারী শহিদদের যেমন পরিচিত করাবে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে লিঙ্গীয় পক্ষপাত দূর করার ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে।

জোবাইদা নাসরীন
ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

শহিদ চারুবালা বিশ্বাস

জন্ম : ১৯৩০
মা : জানা যায়নি
বাবা : জানা যায়নি
শহিদ হবার দিন : ২রা মার্চ ১৯৭১
ঠিকানা : যশোর
পেশা : গৃহিণী
মৃত্যুর সময় বয়স : আনুমানিক ৪০ বছর
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তান সেনাবাহিনী

নীলগঞ্জ শ্মশানে তাঁর সমাধির ওপরে লেখা আছে :
'মাতা : চারু বিশ্বাস
মৃত্যু : ২রা মার্চ ১৯৭১
প্রতিষ্ঠাতা : মো. ছাবদার হোসেন এবং কন্যা অনিমা বিশ্বাস'

যশোরের চারুবালা বিশ্বাস হলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নারী শহিদ। অনেকেই চারুবালাকে তাঁর মৃত্যুর আগে চিনতেন না; কিন্তু তাঁর মৃত্যু শুধু তখনকার চলমান আন্দোলনের গতিকেই বাড়িয়ে দেয়নি, যশোরের নারীসমাজকেও রাজপথে নামতে প্রবলভাবে প্রাণিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুর প্রতিবাদে যশোরে সর্বস্তরের নারীরা ঝাড়ু মিছিল বের করে, যশোর পরিণত হয় এক উত্তাল নগরীতে। গৃহবধূ চারুবালার শহিদ হবার মধ্য দিয়ে সেই সময়ের অসহযোগ আন্দোলন এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, যা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ তখনকার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ৩ মার্চের অধিবেশন বাতিল এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত করেন। ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বেতার বিবৃতির ভেতর দিয়ে তার আসল চেহারা সকলের কাছে ধরা পড়ে যায়। বাংলার মানুষ বুঝল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এতদিন যা করেছেন বা বলেছেন, তার সবকিছুই একটা সাজানো ব্যাপার। ইয়াহিয়া আসলে পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তিরই প্রতিভু। নির্বাচনের পর গণপরিষদের বৈঠক ডাকতে দীর্ঘ গড়িমসি, মূলনীতি বিষয়ে দাম্ভিক ঘোষণা, সংবিধান সংক্রান্ত হুমকি, মুজিব-ভুট্টোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ইত্যাদি কাজের এক জঘন্য নায়ক এই ইয়াহিয়া খান।

২ মার্চ ঢাকায় সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। এদিন রাত পৌনে আটটায় ঢাকা বেতারের মাধ্যমে সান্ধ্য আইন ঘোষণার কথা প্রচারিত হয়। ঘোষণায় বলা হয়, প্রতিদিন সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকবে। জনতা সান্ধ্য আইনের তোয়াক্কা না করে মিছিল বের করে। ঢাকা নগরী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পথে পথে নামে জনতার ঢল। স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে ঢাকার আকাশ-বাতাস। তারা আওয়াজ তোলে 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধর/ বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'পিণ্ডি না ঢাকা/ঢাকা ঢাকা।' ২ মার্চ সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। এই প্রসঙ্গে 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ বলা হয়—

"গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। এই সভা বটতলায় হবার কথা থাকলেও বিপুল জনসমাগম হওয়াতে সভামঞ্চ কলাভবনের শেডে[১] নিয়ে যাওয়া হয়। সকাল থেকেই লাঠি, রড সজ্জিত ছোট-বড় মিছিল বটতলায় এসে জড় হতে থাকে। বেলা দশটার পরেই বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকা ছাত্রছাত্রীর দৃপ্ত পদধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। সভাস্থলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। ১০-১৫ মিনিটের সময় ঢাকসু'র সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব এসে হাতে মাইক নিয়ে সভার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। স্লোগানরত উত্তেজিত ছাত্ররা তখন আব্দুর রবের কণ্ঠ মিলিয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে স্লোগান দেয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী সভা শুরু করার সাথে সাথেই সমবেত ছাত্ররা হাত তুলে শপথ পাঠ করেন। সমবেত ছাত্ররা শপথ নেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং তার নির্দেশ অনুসরণ করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন। তাঁরা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমেরও শপথ গ্রহণ করেন। ...সভায় সবুজ জমিনের ওপর লাল বৃত্তের মাঝে পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা একটি পতাকা উত্তোলন করা হয়।"

ঢাকায় অসহযোগের এই ধরনের প্রস্তুতি গ্রামে-গঞ্জে, জেলা ও মহকুমাতেও ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই বুঝে যায় আসলে এসবই এক পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতির অংশবিশেষ।

মার্চের প্রথম দিক থেকেই শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন জেলা এবং মহকুমাগুলোতে অসহযোগ। এই অসহযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই যশোরে ৩ মার্চ ঈদগা ময়দান থেকে জনতার একটা মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে অনেকের মধ্যে ছিলেন এ.কে.এম খয়রাত হোসেন, আব্দুস সালাম, আলী হোসেন মনি, আব্দুল মান্নান, এ.কে.এম ফিরোজ, বাবু অশোক রায়, গাজী আব্দুল হাই, জালাল উদ্দিন রতন, শহিদ ওমর ফারুক, ভীম সেনদাসু ফকরুজ্জামান বাবুল প্রমুখ। এই সময় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে পাকবাহিনীকে লক্ষ্য করে কেউ কেউ ইট ছুঁড়লে পাকবাহিনী পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মিছিলের ওপর গুলি ছোঁড়ে। এই মিছিল সম্পর্কে বিমল চৌধুরী জানান, বিধবা ছিলেন চারুলতা। সেদিন সকাল এগারোটায় যখন সেনাবাহিনীর লোকেরা মিছিলকে

---

১. সুকুমার বিশ্বাস, 'মুক্তিযদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী', মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে তখন কয়েকজন তরুণ-যুবক চারুবালার ঘরে ঢুকে পড়ে। চারুবালার ঘরটি ছিল গোলপাতা দিয়ে তৈরি। প্রথমে তিনি তাঁদেরকে তাঁর ঘরে কাঠের বাক্সের মধ্যেও লুকিয়ে রাখেন। এবং নিজে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। চারুবালা তখন ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় সেনাবাহিনীর ছোঁড়া গুলি এসে লাগে চারুবালার মাথায়। হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় আহত হন মনিরুজ্জামান মনি এবং খুরশিদ আলম লালু নামের দুই ব্যক্তি।

গৃহবধূ চারুবালার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যশোরে প্রথমবারের মতো সর্ববৃহৎ মিছিল হয়। বিভিন্ন বয়সি নারী-পুরুষসহ সবাই রাস্তায় নেমে আসেন। এতদিনের অচেনা চারুলতা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই হঠাৎ করে হয়ে ওঠেন সকলের আত্মার আত্মীয়। চারুলতার লাশ নিয়ে হয় প্রতিবাদ মিছিল। লাশ বহন করেছিলেন তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য মশিউর রহমান যাদু মিয়া, বিমলরায় চৌধুরী, রওশন আলী প্রমুখ। পরে তাঁর লাশ নীলগঞ্জ মহাশ্মশানে দাহ করা হয়।

এই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম নারী শহিদ চারুবালার তথ্য নিয়েও রয়েছে নানা ধরনের বিভ্রান্তি। তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে কেউ খুব বেশি তথ্য দিতে পারেননি। কেউ বলেছেন তাঁর দুটো ছেলে ছিল। আবার কেউ বলেছেন, তারা এ বিষয়ে কিছু জানেন না। এমনকি বর্তমানে চারুবালার সেই ঘরটিও নেই। কারো কারো, দেয়া তথ্য মতে, এখন সেখানে গড়ে উঠেছে হাসান ইন্টারন্যাশনাল হোটেল নামে একটি হোটেল। অনেকেই বর্তমানের ডা. মুস্তাফিজুর রহমানের এখানকার বাড়িকেই দেখিয়ে বলেছেন, ওটাই চারুবালার আগের ঠিকানা।

শহিদ যোগমায়া দে

জন্ম : আনুমানিক ১৯২৫
মৃত্যু : ২৬ মার্চ ১৯৭১
মা : মন্তসী দাস
পিতা : স্বর্গীয় কালীপদ দাস
স্বামী : শহিদ মধুসূদন দে
পরিবারে অবস্থান : সাত ভাইবোনের মধ্যে চতুর্থ, বোনদের মধ্যে দ্বিতীয়
ঠিকানা : বাবুর দীঘির পাড়, বিক্রমপুর, ঢাকা
মৃত্যুর সময় আনুমানিক বয়স : ৪৫।
সন্তান মোট ১১ জন। পাঁচ ছেলে ও ছয় মেয়ে। বড় ছেলে ও ছেলের বৌ একই সময়ে শহিদ হন।
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তান সেনাবাহিনী

যাঁরা নিজেরা কখনও ইতিহাস রচনা করেন না অথচ ইতিহাসের উপাদান হয়ে ওঠেন, তাঁদেরই একজন শহিদ যোগমায়া দে। সাদামাটা, সহজ জীবনযাপন অর্থাৎ সরল গৃহিণীপনাই ছিল তাঁর জীবনধর্ম। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর স্বামী শহিদ মধুসূদন দে'র কথা বিভিন্নভাবে উঠে আসলেও যোগমায়া দে'র কথা বলা হয়নি সেভাবে। শহিদ হিসেবে তিনি থেকে গিয়েছেন সকলের অগোচরে, অন্তরালে। এমনকি তাঁর বেঁচে থাকা সন্তান-সন্ততিরাও তাঁর কথা বলতে গিয়ে বারবার বলেছেন তাঁদের বাবার কথাই। স্বীকার করেছেন, মা সম্পর্কে বলার ক্ষেত্রে তাদের অনভ্যস্ততার কথা।

পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ডাকতেন 'কেটি' বলে। বাবা কালীপদ দাস এবং মা মন্তসী দাসের তিন ছেলে, তিন মেয়ের মধ্যে চতুর্থ এই কেটি। পুরো নাম যোগমায়া দাস। গ্রামের বাড়ি বাবুর দীঘিরপাড়, শ্রীনগর, বিক্রমপুর। যোগমায়ার বাবা চাকরি করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর জন্মও সেখানে। তাঁর বাবা-মার কেউই আজ বেঁচে নেই। তাই তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কিত তথ্য কেউই তেমন দিতে পারেননি। ভাইবোনদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে মারা গেছেন। যে দু'একজন বেঁচে আছেন, তাঁরা ভারতীয় নাগরিক। বর্তমানে যেখানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, তারই আশপাশের ছোট্ট একটা বাড়িতে শৈশব কেটেছে যোগমায়া আর তার অন্য ভাই-বোনদের। ছোটবেলাতেই মা-হারা হন তিনি। ছ-ছ'টি নাবালক শিশুর দেখাশোনা করবে কে? এই চিন্তায় তখন অস্থির তাঁদের নিকটাত্মীয়রা ফলে যোগমায়াসহ তাঁদের সবাইকে পাঠিয়ে দেয়া হয় গ্রামের বাড়িতে। সেখানে ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করতে করতেই তাঁর আর

স্কুলে যাওয়া হয়নি। যোগমায়ার সবচেয়ে ছোট ভাইটির বয়স তখন মাত্র এক থেকে দেড় বছর। কৈশোর না-পেরুনো যোগমায়া নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ওই বয়সেই বুঝে গিয়েছিলেন কাকে বলে সংসারের দায়িত্ব এবং কাকে বলে মায়ার বন্ধন!

বারো বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় গ্রামের ছেলে মধুসূদন দে অর্থাৎ মধুর সঙ্গে। মধু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ক্যান্টিন পরিচালনা করেন। তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সকলের কাছে 'মধুদা' হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। শহিদ হওয়ার পর তাঁর ওই সংক্ষিপ্ত নাম এখনও অম্লান। যোগমায়ার যেদিন বিয়ে হয়, সেদিন তাঁর ছোট ভাইটি কেবলই কাঁদছিল এবং তাঁর কোলে থাকতে চেয়েছিল। স্নেহপ্রবণ যোগমায়া তাঁর ছোট্ট ভাইকে কোনোভাবেই এড়াতে পারেননি। তাকে কোলে নিয়েই বসেছিলেন বিয়ের পিঁড়িতে। বিয়ের দিনও সাংসারিক একান্ত দায়িত্ব থেকে তিনি রেহাই পাননি।

মধুর সঙ্গে সংসার পাততে এসে যোগমায়া আবার ফিরে আসেন তাঁর শৈশবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। যোগমায়া দাস থেকে হন যোগমায়া দে। বিক্রমপুর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলরব মুখরিত প্রাঙ্গণে।

সময় পেরুতে লাগল সময়ের নিজস্ব গতিতেই। কালক্রমে যোগমায়া ছয় ছেলে আর পাঁচ মেয়ের মা হলেন। নিজে পড়াশোনা করার সুযোগ না পেলেও ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেরই হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর কাছে। খুব একটা বাইরে বের হতেন না তিনি। রান্নাঘরে বসেই মেঝের ওপরে চক দিয়ে অ, আ, ক, খ লিখে ছেলে-মেয়েদের অক্ষরজ্ঞান দিতেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। পড়াশোনার সুযোগ না পেলেও তিনি নিজের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক পাঠ্যের পড়ায় ভুল শোনামাত্র ধরতে পারতেন। কেননা সেই ছোট্টবেলায় প্রাথমিক পাঠ্যের বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে ছড়া, কবিতা ইত্যাদি শুনে শুনেই তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

ক্যান্টিন পরিচালক মধুর সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো, অনেকের ক্ষেত্রে অভিভাবকের মতো। সেই সম্পর্কের বৃত্তের বাইরে থাকতে পারেননি যোগমায়াও। তাই তো বিশেষ করে পূজা-পার্বণ উপলক্ষে সন্দেশ বানাতেন। ক্যান্টিনে খেতে আসা ছাত্রদের জন্য পরিবেশন করতেন। মূল্য নিতেন না। স্বামী মধুসূদনের মাধ্যমেই এটা করা হতো। কিন্তু নেপথ্যে থাকতেন যোগমায়া। বড় মেয়ে কন্যা অনিমা দে। তিনি জানান, সন্দেশের সঙ্গে নারকেলের নাড়ু, মুড়ির মোয়া, তিলের নাড়ু, পিঠা, পায়েশ, লুচি এবং নিরামিষ তরকারি নিজের হাতে তৈরি করে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াতেন। তিনি ভালো রান্না করতে জানতেন এবং সেলাই কাজও ভালো জানতেন। ছেলে-মেয়েদের জামা-কাপড় তিনি নিজেই সেলাই করতেন। এছাড়া কাঁথা বা চাদরে সূক্ষ্ম কারুকাজের কাজ করতেন যা বহন করতে সৃজনশীল মনের পরিচয়।

বিভিন্ন আন্দোলনের সময় ছাত্রছাত্রীদের ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস মারা হলে আহত ছাত্রদের সেবার দায়িত্বও যথাসম্ভব পালন করতেন তিনি। তাঁদের আবাসস্থল ছিল

মেডিকেলের পাশে। ফলে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন বাসাবাড়িতে আশ্রয় নিত। তখন যোগমায়া দে তাঁর সন্তান আর প্রতিবেশীদের সাহায্যে আহত ছাত্রছাত্রীদের ডেটল, তুলা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিতেন। কখনও কখনও এক্ষেত্রে গাঁদা ফুলের পাতা এবং দূর্বাঘাসের রসও ব্যবহার করতেন আর টিয়ার গ্যাস মারা হলে সামনের পুকুর থেকে বালতি বালতি পানি তুলে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের চোখে-মুখে দেয়ার জন্য সরবরাহ করতেন।

যোগমায়া দে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৯৮% ভোট পেয়েছিল; কিন্তু যোগমায়া দে নিজের সিদ্ধান্তে কুঁড়েঘর মার্কায় (ন্যাপ-মোজাফ্ফর) ভোট দিয়েছিলেন, যদিও তাঁর স্বামী অন্য মার্কায় ভোট দেন। এটি তার পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং স্বাধীনতাকে এবং তার চর্চার স্বরূপকে প্রকাশ করার পাশাপাশি যোগমায়া দে'র রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও বহন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন চলছে তুমুল ছাত্র আন্দোলন। পাকিস্তানি শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে গোটা দেশ রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ছাত্রদের আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে নানাভাবে একাত্ম করে ফেলেছিলেন মধুসূদন দে। স্বামীকে নিয়ে কখনও কখনও ভয় পেতেন যোগমায়া, কখনও সাহস করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতেন দেশের খবর। রাজনৈতিক এসব ডামাডোলের মধ্য দিয়েই বড় হচ্ছিল তাঁর ছেলেমেয়েরা। বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে নতুন বউ এনেছেন ঘরে। সেও বেশিদিন আগে নয়, যুদ্ধের দামামা বাজার মাত্র ছ-সাত মাস আগে। তখন তারা থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবমন্দির সংলগ্ন কোয়ার্টারের চারতলা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলায়।

১৯৭১ সালের প্রথম দিক থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা হয়ে উঠতে থাকে থমথমে। এর মধ্যে ধড়পাকড় শুরু হলো দেশ জুড়ে। যোগমায়া তাঁর অজান্তেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এক বিশাল দায়িত্বের সঙ্গে। ছাত্রনেতারা তখন রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কোনো সংবাদ দেয়ার জন্যে মধুর ক্যান্টিনে না গিয়ে যোগমায়াকে দিয়ে যেতেন কিংবা এ সংক্রান্ত চিঠি রেখে যেতেন মধুদাকে দেয়ার জন্য, মধুদা যেন সেই চিঠিটা আবার যথাযথ প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেন। যোগমায়া নিজের মনে করেই এই কর্তব্য ঠিকঠাক মতো করতেন। এভাবে সেই দুঃসময়ে যোগমায়াই হয়ে উঠেছিলেন নেপথ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংবাদবাহক।

মার্চের প্রথম দিক থেকেই যোগমায়া স্বামীকে গ্রামের বাড়ি চলে যাবার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। তিনি নিজে তখন অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর স্বামী মধুসূদন দে তাঁর এই প্রস্তাবে রাজি হননি। একে তো স্ত্রীর শরীরের এই অবস্থা, দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এ-ভাবে একা রেখে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চাননি। কেননা তাঁর আয়ের উৎসস্থল 'মধুর ক্যান্টিন' শুধু নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রই তো তাঁর আত্মার আত্মীয়। তাদের ছেড়ে তিনি একা স্বার্থপরের মতো কোথায় যাবেন?

তারপর এলো সেই ভয়াল ২৫ মার্চের কালো রাত। ঢাকা পরিণত হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কসাইখানায়। যোগমায়া দে'র ছেলে বাবুলচন্দ্র দে'র ভাষায়, 'আমরা

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর বিল্ডিংয়ের দোতলায় থাকতাম। তার অবস্থান ছিল টিএসসি থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যেতে যে প্রধান সড়ক, তার পাশে। আমাদের বিল্ডিং- এর পেছনে ড. জি. সি. দেবের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ করা বাংলো বাড়ি, প্রধান সড়কের অপর পাশে জগন্নাথ হলের মাঠ পেরিয়ে জগন্নাথ হল ভবন। বিল্ডিং-এর আরেক পাশে শিব মন্দির, বাংলা একাডেমীর পেছন দিক ও তার পাশে সায়েন্স ভবন।

"রাত যত বাড়ছে, গোলাগুলির শব্দও তত বাড়ছে। এক সময় প্রধান সড়ক থেকে মর্টার, মেশিনগানসহ টার্গেট করা হলো জগন্নাথ হলকে। রাতভর চলল অবিরাম গুলি বর্ষণ আর বহ্ন্যুৎসব। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চারদিক থেকে ভেসে আসতে থাকে মর্মভেদী 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার ধ্বনি। আমাদের বাসার সবারই তখন ভয়ে প্রায় জড়োসড়ো অবস্থা। বাবা, মা, দাদা, বৌদি সবাইকে বেশ চিন্তিত মনে হলো। তার সাথে আশঙ্কা আর ভয়। কিন্তু চারদিকের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বেশি কিছু ভাববার অবকাশ দিল না। এমনিভাবে আতঙ্কের মধ্যে সারারাত কাটে।

কিন্তু রাতের আঁধার কেটে সকাল হতেই আমাদের জীবনে চিররাত্রি নামিয়ে দিল ঐ নরপিশাচ পাকবাহিনী। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা আগে থেকেই তৈরি করেছিল। সেই তালিকা মোতাবেক দালালদের সহযোগিতায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের খোঁজা শুরু করল, পাশাপাশি চলল নির্যাতন ও হত্যা।

"২৫ তারিখেই যোগমায়া দে স্বামীকে বলেছিলেন কোথাও সরে যেতে, দেশে মনে হয় বড় কোনো ধরনের ঝামেলা হবে। কিন্তু মধু নিরুত্তর। বললেন, 'দেখা যাক কী হয়? আজকের রাতটা দেখি, দরকার হলে কালই সরে যাব।' সেই সকালের বর্ণনা দিয়ে যোগমায়া দে'র ছেলে বাবুলচন্দ্র দে আরো বললেন, সকালেই তারা আমাদের বাসভবন এবং অধ্যাপক জি. সি. দেবের বাংলো ঘেরাও করে ফেলল। প্রথমেই তারা গেল জি. সি. দেবের বাংলোতে। পাকবাহিনী এবং তাদের দোসররা জি. সি. দেবের চোখ বেঁধে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। তারপর তাঁর পাকস্থলিতে বেয়নেট চার্জ করতে করতে তাঁকে জগন্নাথ হলের মাঠের দিকে নিয়ে যায়। আমরা জানালা দিয়ে এসব খুব সাবধানে দেখছিলাম আর ভয়ে আমাদের শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। বাবা, মা, দাদা, বৌদিসহ আমরা প্রায় সমস্ত ভাইবোনই ঐসব দুঃসহ যন্ত্রণাপূর্ণ দৃশ্যের কিছু কিছু দেখেছি। এরই মধ্যে বাবা ঘরের পরিবেশ স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রত্যেকের ভয় কাটানোর জন্য মাকে চা বানাতে বললেন। বলেই নিজে ঠাকুরের নাম মনে মনে স্মরণ করতে লাগলেন। তারপর ঠাকুরের মূর্তির সামনে আসন পেতে বসলেন। আমরাও ঘরের কোনে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলাম জানালা দিয়ে গুলি ঢুকতে পারে এই আশঙ্কায়। আমাদের বাসা দেখিয়েছিলেন এক সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাইভার তোতা মিয়া। এর পরপরই আমাদের দরজায় বুটের আঘাত। গালিগালাজ দিয়ে তারা দরজা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। এই অবস্থায় বাবা দরজা খুলে দিয়ে দু'হাত উপরে তুলে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু ঘাতকেরা বাবাকে ধাক্কা মেরে পাশের ফ্ল্যাটে বসিয়ে রাখল

এবং একজন রাইফেল তাক করে রাখল তার দিকে। তারপর কয়েকজন সোজাসুজি ঘরের ভেতর ঢুকে রাইফেলের আঘাতে ভাংচুর শুরু করল। এইভাবে পাশের ঘরে ঢুকেই তারা দেখতে পেল বৌদিকে। বৌদি ছিলেন পাঁচ মাসের বিবাহিত জীবনের নববধূ। গ্রামের মেয়ে তিনি। ভয়ে-সংকোচে ঘরের কোনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বৌদিকে তারা ধরতে গেলে বৌদি এঘর-ওঘর ছোটাছুটি শুরু করে দেন। এসময় দাদা পাক আর্মিদের ফাঁকি দিয়ে ঘরের বের হতেই দুর্গা দি চিৎকার করে বলে, দাদা, বৌদিকে মেরে ফেলল। দাদা ঘরে ফিরে এসে বৌদিকে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করতে বলেন, কিন্তু ঘাতকেরা সাথে সাথে দাদার বুক বরাবর গুলি করে। দাদা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দাদার রক্তে সমস্ত ঘর ভেসে যায়। দাদা সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন। বৌদির পরনে ছিল বিয়ের অলংকার। ঘাতকেরা বৌদির হাত থেকে বালা-চুড়ি ইত্যাদি খুলে নেয়। তারা তার কানের দুল ধরে এমনভাবে টান দেয় যে, বৌদির কানসহ দুল উঠে আসে। দাদার মৃত্যু দেখে বৌদি সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করে মারা যান। তারপর ঘাতকেরা বৌদির দেহ লক্ষ্য করে বিক্ষিপ্তভাবে গুলি করে। বৌদির দেহ ঘরের কোণ ঘেঁষে এমনভাবে পড়ে থাকে, দেখে মনে হয়, যেন বসে আছেন। কিন্তু নিশ্চিতই মৃত। বাবা-মাসহ আমরা সমস্ত ভাই-বোন এরকম কাছ থেকে একের পর এক নিদারুণ নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ দেখে পাথর হয়ে যাই। চোখ দিয়ে জল ঝরছে কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না। কারণ, কখন কার ওপর তারা চড়াও হবে, কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। এরপর বাবাকে মারার জন্য তারা রাইফেল ঠিক করলে মা দৌড়ে তাঁকে আড়াল করার চেষ্টা করেন। মা পাকবাহিনীকে বলেন, আমাদের সব কিছু নিয়ে যাও। তার বিনিময়ে আমাদের কেবল প্রাণ ভিক্ষা দাও, আমাদের মেরো না, আমরা কি অপরাধ করেছি? কিন্তু মার এই আকুল প্রার্থনার জবাবে ঘাতকেরা বলে, 'জয় বাংলা বোলো, মুজিব বাপকো বোলাও। বাঁচায়েগা।' তারপর তারা নিদারুণ কষ্ট দিয়ে মাকে মারল। প্রথমে ঘাতকেরা বেয়নেট দিয়ে মায়ের হাত দুটো খুঁচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে শরীর থেকে তা ঝুলিয়ে ফেলে। মার শরীরের রক্তে চারদিক ভেসে যায়। সাথে সাথে মাসহ বাবাকে লক্ষ্য করেও তারা অজস্র গুলি করে। পেট-বুক ও গলা গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মায়ের গলায় এমনভাবে গুলি ঢুকেছিল যে, তার জিব্‌টা বেরিয়ে পড়েছিল। সবচেয়ে দুঃসহ ঘটনাটিও ঘটে এই অবস্থাতেই। শারীরিক আঘাতের পর আঘাতের পরই মার পেটের বাচ্চাটি বেরিয়ে আসে।

"পাকবাহিনী আমাদের বাসায় আবার ফিরে আসে। আমাদের উপরে চার তলায় (আমরা থাকতাম দোতলায়) তোতা মিয়া থাকতেন। উনি গিয়ে মিলিটারিদের জানিয়ে দিয়ে আসেন যে বাবা মারা যাননি। হানাদারেরা এসে ঐ দুই জন বাঙালি বাবাকে ভয় কাটিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে আমরা ভাই-বোনেরা বাবাকে জড়িয়ে ধরে রেখে তাঁকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকি। তারা কিছুই শোনে না। আমাদের লাথি মেরে সরিয়ে দিতে থাকে। তখন বাবা ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে কোথায় নিয়ে

যাচ্ছ? ওরা বলে, হাসপাতাল থেকে ঠিক করে দিয়ে যাব। তখন বাবা রানুকে দেখিয়ে বলে, ওরও তো গুলি লেগেছে, ওকেও নিয়ে চলো। তখন পাকিস্তানি হানাদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, 'লেড়কি কো হটাও'। রানুকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তারা বাবাকে নিয়ে যায়। যতদূর সম্ভব আমরা দেখার চেষ্টা করি ওরা বাবাকে কোথায় নিয়ে যায়। দেখলাম ওরা বাবাকে জগন্নাথ হলের মাঠে নিয়ে গেল। যে দু'জন বাঙালি মিলিটারির নির্দেশে বাবাকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মালি, অপরজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাদের দিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গায় লাশ টানিয়েছে। তাঁরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে জেনেছিল জগন্নাথ হলের মাঠে বিভিন্ন জায়গা থেকে আনা লাশ এবং আহতদের জড়ো করা হয়। সেখানে বাবাকেও নিয়ে যাওয়া হয়। অধ্যাপক জি.সি. দেব, ডা. মনিরুজ্জামান, সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য, অনুদ্বৈপায়ণ ভট্টাচার্য প্রমুখ স্যার এবং অসংখ্য ছাত্র ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে বাবাকেও তারা হত্যা করে গণসমাধিতে মাটি চাপা দেয়। আর ঘরে মা, দাদার ও বৌদির লাশ তিনটি পড়ে থাকে। আহত রানুসহ আমরা ভাইবোনেরা তখন বাসায়। জগন্নাথ হলের মাঠে যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রাণে বেঁচে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনেরা এই হত্যাযজ্ঞের পর লাশ খুঁজতে বের হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে আমাদের জানিয়েছিলেন তারা দেখেছেন অন্য সব আহত-নিহতদের মধ্যে বাবাও ছিলেন। তিনি অনেকক্ষণ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জল জল বলে আর্তনাদ করেছেন; কিন্তু সেখানে কেউ জল দেয়ার ছিল না। বাবা এমনিভাবে কষ্ট পেতে পেতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাঁকে গুলি করার পর আমার ছোট বোন রানু মিলিটারিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলে তাঁর গায়েও গুলি লাগে।

মধুসূদন দে' বেঁচেছিলেন একদিন। এই কথা পরে তারা জানতে পেরেছিলেন জগন্নাথ হলের মালি রূপ চাঁদ এবং কালা চাঁদের কাছ থেকে।

আর যোগমায়া দে! তিনি শহিদ হয়েছিলেন সন্তান প্রসব করার মুহূর্তে।

শহিদ রিনা রানী দে (পাল)

জন্ম : ১৯৫৩
শহিদ হওয়ার তারিখ : ২৬ মার্চ ১৯৭১
জন্মস্থান : ব্রজযোগিনী, কাঠপট্টি, মুন্সীগঞ্জ
মা : জানা যায়নি
বাবা : তারিণী মোহন পাল
অবস্থান এক বোন চার ভাই-এর মধ্যে তিন নম্বর
পারিবারিক নাম : পুষ্প
পেশা গৃহবধূ
মৃত্যুর সময় বয়স : ১৮ বছর
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী

১৯৭১ সালের প্রথম দিকেই অর্থাৎ ঢাকায় পাকবাহিনীর চিরুনি অভিযান শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই যে কয়জন প্রাণ দিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায়, তাঁদের মধ্যে একজন রিনা রানী পাল। মুন্সীগঞ্জের কাঠপট্টি এলাকার ব্রজযোগিনী গ্রামের তরণীকান্ত পালের একমাত্র মেয়ে রিনা রানী পাল। মেয়েকে তিনি আদর করে ডাকতেন 'পুষ্প' বলে। সাধারণত সেই সময়ের পরিবারগুলোতে ছেলেদের বাড়তি আদর থাকলেও গ্রামের মেয়ে 'পুষ্প'র জীবন ছিল এর ব্যতিক্রম। একমাত্র মেয়ে বলেই কিনা, তাঁর বাবার অতি আদরের ছিল এই পুষ্প। তাই তাঁর বিয়ের অনেক সম্বন্ধ এলেও তিনি সহজে রাজি হতেন না। গ্রামের স্কুলেই পড়াশোনা শুরু করেন পুষ্প। পড়েছেন দশম শ্রেণী পর্যন্ত। তাঁর নিজের আরো পড়ার আগ্রহ থাকলেও সেটা আর হয়ে ওঠেনি। পিতারও অশেষ আগ্রহ ছিল তার মেয়েকে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করবেন যতদূর পারা যায়। কিন্তু দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং সেই সময় নারী-শিক্ষার তেমন প্রসার না হওয়াতে তাঁর স্বপ্ন বেশিদূর এগোতে পারেনি। পিতা তরণীকান্ত চাকরি করতেন সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে। সত্তরের শুরুতে দেশে যে অবস্থা ছিল, তাতে কন্যাকে নিয়ে তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। ফলে তাঁকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আজীবন গ্রামে থাকা পুষ্পের জীবনে প্রথম শহরের ছোঁয়া লাগে, যেদিন তিনি বউ হয়ে প্রথম ঢাকায় আসেন।

বিয়ে হয় তাঁর শহরের রাজনীতির কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের স্বত্বাধিকারী মধুসূদন দে'র বড় ছেলে রঞ্জিত কুমার দে'র সঙ্গে। রঞ্জিত দি গ্রেট ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অফিসার পদে চাকরি করতেন।

১৯৭০ সালের প্রথম দিকে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান হয় পুষ্পের। বিয়ে হয় একই বছরের মাঝামাঝি সময়ে। বিয়ের অনুষ্ঠান হয় মধুর ক্যান্টিনেই। তাতে যোগ দিয়েছিলেন সেই সময়ের প্রথম সারির ছাত্রনেতারা। কেননা, মধু'দা এবং তাঁর ক্যান্টিনই ছিল তাঁদের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উৎসস্থল। তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রথম এত মানুষ দেখে শহর সম্পর্কে ধারণা পান রিনা। তারপর এসে ওঠেন শ্বশুর মধুসূদন দে'র তেরো সদস্যের সংসারে। পরিবারের বৌ হিসেবে তাঁর যথা কর্তব্য পালন করতে থাকেন পুষ্প।

বড় বৌদির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ননদ প্রতিভা দে বলেন, "আমাদের বাসায় যেহেতু অনেক লোক আসতো, বৌদি প্রথম প্রথম খুব অবাক হতেন। উনি মাঝে মাঝে আমাকে কিংবা দাদাকে জিজ্ঞেস করতেন, "কী কথা বলে ঐ লোকগুলো বাবার সাথে?" আবার যখন তাঁরা তাঁকেই ডাকতেন তখন তিনি খুশিই হতেন।

সবচেয়ে অবাক হতেন এবং ভয়ও পেতেন তিনি মিছিলের শব্দ শুনলে। জিজ্ঞেস করতেন, 'ঢাকা শহরে এত গোলমাল কেন? আমাদের গ্রামে তো এত গোলমাল নেই? কেন সবাই এত চিৎকার করে? এটা কি মিছিল? মিছিলে ওরা কী বলে? এই সব। প্রথম কয়েক মাস এই সব প্রশ্ন করতেন। আসলে দাদা এবং বৌদির সংসার করাও খুব বেশি দিন হয়নি। বৌদি মাত্রই সংসারে ঢুকেছিলেন। তখন তো শহিদ মিনারে খুব বেশি অনুষ্ঠান, নাটক এইসব হতো। আমাদের বাড়ির কাছে হওয়াতে আমরা সেসব প্রায়ই দেখতে যেতাম। কিন্তু বৌদি কখনও যেতেন না। কেননা, বৌদির কাছে এ সবই ছিল নতুন বিষয়। তবে এ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে বৌদির আগ্রহ ছিল প্রবল। আমরা নাটক, অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখে ফিরলে তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করতেন, ওখানে কী হয়েছিল, কে কী করেছিল, সুন্দর হয়েছে কী-না এই রকম হাজারো প্রশ্ন।

বিয়ের প্রায় সাত-আট মাস পরেই এলো সেই ভয়াল ২৫ মার্চ, সেদিন ঢাকা পরিণত হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কসাইখানায়। ২৬ মার্চ ভোরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক এবং কর্মচারীদের পাশাপাশি মধুসূদন দে'র বাসাতেও সংঘটিত হয়েছিল সেই নারকীয় তাণ্ডব। কেননা শত্রুরা জেনে গিয়েছিল মধুর ক্যান্টিনই ছিল এতসব আন্দোলন-সংগ্রামের মন্ত্রণাগার। ২৫ মার্চ রাতেই বুঝতে পেরেছিলেন সবাই কিছু একটা হতে যাচ্ছে। কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছিল না তার স্বরূপটা কি হবে? বৌদিসহ বাড়ির সবাই একটা গভীর আশঙ্কায় খুবই ভয়ে ছিলেন।

"সকালে বেশ জোরেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। সে সকালের বর্ণনা দিলেন রিনা রানী দে'র ননদ প্রতিভা দে। বললেন, "সকাল ছয়টার দিকে প্রচণ্ড কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে দিল আমার ছোট ভাই অরুণ চন্দ্র দে। তাঁর বয়স তখন দশ বছর। আমি সেদিন বাসায় ছিলাম না। পরে শুনেছি আমাদের বাসা দেখিয়ে দিয়েছিল সেই সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাইভার তোতা মিয়া। সে থাকত একই বিল্ডিংয়ের চার তলায়। ওরা এসেছিল সাত-আটজন। বাবা তখন সবে মাত্র স্নান করে পূজার ঘরে বসেছেন। মা চায়ের পানি দিয়েছেন চুলোয়। এর মধ্যে দুইজন লোক বাবার কাছে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস

করলেন। বলামাত্রই বাবাকে টানতে টানতে তারা নিয়ে গেল পাশের বাসার সামনে। বাবাকে টানতে দেখে মা বাবাকে বাঁচাতে গেলেন। ওরা প্রথমেই মাকে গুলি করে তাঁর দুই উরু আলগা করে দিল। মা ছিলেন তখন অন্তঃসত্ত্বা, সেদিন সকালেই তাঁর লেবার পেইন হচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। মাকে ঘরের সামনেই তারা প্রথমে বেয়োনেট দিয়ে আঘাত করল। মায়ের গলায় থাকা সোনার চেইন তিন টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল। বেয়োনেট দিয়ে তারা মার গলায় প্রথম আঘাত করে। তাতে মায়ের জিব অনেকখানি বের হয়ে আসে। এরপর আমার মা মাটিতে পড়ে যান এবং মারা যান সেখানেই। মায়ের পেটের বাচ্চাটি বের হয়ে আসে ঐ অবস্থাই। বাবাকে পাশের বাসায় গুলি করা হয়। বাবা বারবার মার কথা বলছিলেন।

"এরপর ভিতরের ঘরে ঢুকে পাকসেনারা বৌদিকে দেখতে পায়। বৌদি তখন খাটের কোনা ধরে ভয়ে কাঁপছিলেন। আমাদের ভাইবোনেরা অনবরত চিৎকার করছিল। দাদা পাকসেনাদের বৌদির দিকে এগিয়ে যেতে দেখে বৌদিকে হাত উপরে তুলে সারেন্ডার করতে বললেন। বৌদি হাত উঁচিয়ে যখন যেতে উদ্যত, তখুনি তারা গুলি করে। তবে তারা প্রথমে গুলি করে দাদাকে। এরপরেই তারা বৌদিকে লক্ষ্য করে গুলি করে। বৌদি পড়ে যায় ঠাকুরঘরের পাশে। পুরো ঘর তখন ভেসে যাচ্ছিল রক্তে। দেখে মনে হচ্ছিল কেউ বালতি বালতি রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। বৌদি নিজেকে বাঁচাতে যেই ঠাকুরঘরের পেছনে দৌড়ে গিয়েছিলেন, সেখানে বসে থাকা অবস্থায় তাকে গুলি করল পাষণ্ডরা। আমার ভাইবোনেরা দেখে মনে করেছিল বৌদি মারা যাননি। কেননা, বৌদিকে ওই অবস্থাতেও দেখতে আরেকটি প্রতিমা মনে হচ্ছিল। ঘাতকরা চলে গেলে যখন মার দেহটি দেখলাম, তখন বুঝলাম, মা আর বেঁচে নেই। গেলাম দাদার কাছে, দাদাও নেই। অনেক আশা নিয়ে বৌদিকে ডাকলাম। দেখি, বৌদিও কথা বলেন না। তারপর আমার বোন রানু বৌদির কাছে যেতেই পড়ে গেলেন তিনি।

বুঝলাম বৌদিও নেই। এভাবে মাত্র আঠারো বছর বয়সেই এই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কসাইখানার বলি হলেন আমার বৌদি।

শহিদ মেহরুন্নেসা

জন্ম : ১৯৪০
শহিদ হওয়ার তারিখ : ২৭ মার্চ ১৯৭১
জন্মস্থান : কোলকাতা
মা : নুরুন্নেসা
বাবা : আব্দুল রাজ্জাক
ঠিকানা : ৬ নম্বর সেকশন, মিরপুর
অবস্থান : চার ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয়
পারিবারিক নাম : রানী
পেশা : লেখালেখি, মূলত কবি
ঘাতকের পরিচয় : বিহারি

"মুক্তির শপথে দীপ্ত আমরা দুরন্ত দুর্বার,
সাতকোটি বীর জনতা জেগেছে এই জয় বাংলার
পাহাড় সাগর নদী প্রান্তরে জুড়ে–
আমরা জেগেছি নব চেতনার নবাঙ্কুরে
বাঁচবার আর বাঁচাবার দাবী দীপ্ত শপথে জ্বলি–
আমরা দিয়েছি সব ভীরুতাকে পূর্ণ জলাঞ্জলি–
কায়েমী স্বার্থবাদীর চেতনা আমরা দিয়েছি নাড়া
জয় বাংলার সাতকোটি বীর, মুক্তি সড়কে খাড়া।
গণতন্ত্রের দীপ্ত শপথ কণ্ঠে কণ্ঠে সাধা–
আমরা ভেঙেছি জয় বাংলার বিজয়ের যত বাধা
কায়েমী স্বার্থবাদী হে মহল ! কান পেতে শুধু শোন
সাতকোটি জয় বাংলার বীর ! ভয় করি নাকো কোন
বেয়নেট আর বুলেটের ঝড় ঠেলে
চির বিজয়ের পতাকাকে দেবো, সপ্ত আকাশে মেলে
আনো দেখি আনো সাতকোটি এই দাবীর মৃত্যু তুমি
চির বিজয়ের অটল শপথ 'জয় এ বাংলা ভূমি'।"

সম্ভবত 'জনতা জেগেছে' শিরোনামের এই কবিতার জন্যই কবি মেহেরুন্নেসা পড়েছিলেন শত্রুর রোষানলে। বড় সংগ্রামময় ছিল তাঁর জীবন। যে বয়সে রাজধানীর বুকে মেয়েরা রোমান্টিকতার সওয়ার হয়ে আঁচল দুলিয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় অথবা সংসার পাতার স্বপ্নে মশগুল হয়, সেই বয়সে মেহেরুন্নেসা পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতার মখোমুখি। উদয়াস্ত সংগ্রাম করে পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখায় উদ্‌ব্যস্ত। এদেশে কবিতা লিখে আনন্দসভার যাত্রী হওয়া যায়; কিন্তু জীবন ধারণের তা অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে না। তাই শিল্পের সঙ্গে যখন ঘটে শ্রমের সমন্বয়, অভিজ্ঞতার পুঁজি করা জমি জুড়ে নতুন ফসল উৎপাদনকারী মানুষ তখন শ্রমিক-কবি। মেহেরুন্নেসার কবিতা এবং তাঁর জীবিকা এই একই কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎসারিত।

তিনি ছিলেন একজন জীবনসচেতন শিল্পী। রাজধানীর অতিপরিচিত পত্র-পত্রিকার পাতা প্রায়শই সুশোভিত হতো। কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল তাঁর মজ্জাগত। রাজধানীর সাহিত্য সভাগুলোতে তাঁর উপস্থিতি ছিল পেশাগত ব্যস্ততার পরও প্রায় নিয়মিত। কখনোবা ঐ সব সভায় তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ব সাহিত্য সমাজের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগ। যদিও তাঁর জীবন ধারণের জন্য পেশা ছিল একেবারেই ভিন্ন। যন্ত্র নির্ভর-ফিলিপস রেডিও কোম্পানিতে তিনি যন্ত্রাংশ অ্যাসেম্বলের চাকরি করতেন এবং সংসার চালাতেন।

১৯৪০ সালে কোলকাতায় তাঁর জন্ম।

আব্দুল রাজ্জাক আর নুরুন্নেসা দম্পত্তির চার ছেলে-মেয়ের মধ্যে মেহের ছিলেন মেজ। তাঁর দাদা আব্দুল জব্বার খিদিরপুর পাইপ রোডে বসবাস করতেন। নানা মইনুদ্দিন আহম্মেদ ছিলেন টালীগঞ্জের বাসিন্দা। এরা দু'জনই ছিলেন বিত্তবান এবং দু'জনই ছিলেন বি. এন. আর. (বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে)-এর প্রকৌশলী।

দেশ ভাগের পর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পরিবার হিসেবে মেহেরুন্নেসার পিতা ১৯৫০ সালে সপরিবারে ঢাকায় চলে আসেন। কোলকাতার ভবানীপুর এবং কালীবাজারে যথাক্রমে তাদের জুতো ও কাপড়ের দোকান ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাদের দুটি দোকানই পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়। একদার বিত্ত-বৈভবের সবকিছু হারিয়ে ফেলা হয়। ফলে লালিত রাজ্জাক সাহেব ঢাকায় পরিচিতি পান রিফুজি হিসেবেই। তিনি তাঁর ছয় সদস্যের পরিবার নিয়ে ঠাঁই গাড়েন তাঁতি বাজারের ছোট্ট একটি বাড়িতে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এখানে আসার পর মেহেরুন্নেসার পিতা সুবিধাজনক একটা চাকরি জোটাতে পারেননি।

যৎসামান্য টাকা তাঁর হাতে ছিল, তাই দিয়ে ছোটখাটো একটা ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি। পরে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ ছেড়ে চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেয়েছিলেন সেই চাকরি— নাবিস্কো কোম্পানিতে। সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের কাজ।

এরকম এক ভাগ্যবিড়ম্বিত পিতার দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন কবি মেহেরুন্নেসা। আদর করে বাবা তাঁকে রানু বলে ডাকতেন। রানু তাঁর ভীষণ প্রাণবন্ত মেয়ে। কোনো কিছুতেই সে

ঘাবড়ে যেত না কিংবা সহজেই হতাশাগ্রস্ত হতো না। আনন্দ-উচ্ছলতা ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই বৈশিষ্ট্যই বুঝি তাঁর জীবনকে করেছিল কাব্যমুখী। লেখায় এনেছিল সাহিত্যিক ঔজ্জ্বল্য।

দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই তিনি ক্রমশ কবি হয়ে উঠতে থাকেন। কবিতা দিয়েই তিনি সমাজে ব্যাপ্ত তিমির হননে এবং জীবনকে প্রদীপ্ত করার প্রয়াসী হয়ে উঠলেন। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কাছে নতি স্বীকার না করে তিনি তিলে তিলে নিজেকে কবি করে তুলতে লাগলেন। প্রকাশ করতে লাগলেন মর্মের কথাগুলোকে কাব্যের মোড়কে।

পরিবারের প্রতি যে ভালোবাসা, সেটা কেবল পরিবারের বৃত্তেই বদ্ধ থাকেনি, পৃথিবীর মানুষ ও তার নিঃসর্গকে ভালোবাসার দিকেও প্রসারিত হয়েছিল। তার এই ভালোবাসার রূপ প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতার পর কবিতায় নানাভাবে।

মেহেরুন্নেসার পিতা আব্দুল রাজ্জাক সাহেবের স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের চঞ্চলতা থাকলেও তিনি ধর্মভীরু ও রাজনীতি-সচেতন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ছিলেন। পিতার পঠন-পাঠনের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর ছেলেমেয়েদের জীবনেও কিছু না কিছু পরিমাণে। তাঁর ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকেই ছিল সাহিত্যরসিক। লিখত তাদের অল্প বিস্তর কবিতা গান বা গল্প। সন্তানদের মধ্যে মেহেরই ছিল সবচেয়ে বেশি সজীব প্রাণের অধিকারী। পিতার প্রতি তাঁর ছিল একটা আলাদা রকমের ভালোবাসা।

কৈশোরকাল থেকেই মেহেরুন্নেসার কবি-মনের স্ফুরণ ঘটেছিল। গভীর পরিতাপের বিষয়, লাগাতার আর্থিক দৈন্যের কারণে তাঁর সেই কবিত্বশক্তি পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটার সুযোগ পায়নি। এমন কী, একই কারণে তিনি কোনো বিদ্যাপীঠের আঙিনাতেও প্রবেশ করতে পারেননি। অথচ এটা দুর্লক্ষ্য নয় যে, একান্ত সাধনায় তিনি ক্রমাগত একজন সমকালীন এবং সিরিয়াস কবি হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। শৈশবে তাঁর যে অক্ষরজ্ঞান হয় কেবল তাকে সম্বল করে, তিনি পা রাখেন কাব্যের জগতে।

ছোটবেলা থেকেই তিনি বাম হাতে লিখতেন। তাঁর প্রথম দিককার লেখাগুলো ছিল অপরিপক্ব এবং বানান ইত্যাদি ভুলে ভরা। ফলে সেগুলো নির্ভুল করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বড়বোন মোমেনা খাতুন কপি করে দিতেন। সাহিত্য চর্চার পেছনে তাঁর এই বোন এবং পিতার উৎসাহ ছিল প্রচুর। পারিবারিক বৃত্তের বাইরে যাঁরা তাঁর উৎসাহদাতা ছিলেন, তাঁরা হলেন 'কাফেলা'র সম্পাদক আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী, কবি আব্দুস সাত্তার ও কবি সুফিয়া কামালের মতো কবি-সাহিত্যিক। এঁদের সবাই মেহেরুন্নেসার কবিজীবন গঠনে ভীষণভাবে সহযোগিতা করেন।

প্রথমদিকে তিনি ছোটদের উপযোগী কবিতাই বেশি লিখতেন। তিনি 'চাষী' শিরোনামের এ-রকম একটি কবিতা প্রথমে দৈনিক সংবাদের খেলাঘরের পাতায় ছাপার জন্য পাঠান। তাঁর খেলাঘরের সভ্য নম্বর ছিল ৯৪৮। সম্ভবত এই আসরেই ১৯৫২-৫৩ সালের দিকে 'আগুয়ান' নামে তাঁর একটি কবিতা ছাপা হয়। তবে ছোটদের আসরে কবি খুব বেশিদিন লেখেননি। অচিরকালের মধ্যেই তিনি বড়দের উপযোগী লেখা নিয়ে

হাজির হন। ১৯৫৪ সালে 'বেগম' পত্রিকায় তাঁর প্রথম বড়দের উপযোগী লেখা ছাপা হয়।

জীবন ধারণের তাগিদে মেহেরুন্নেসা বেশ আগে থেকেই বাংলা একাডেমীতে কপি রাইটিং-এর কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যখন দেখলেন কবিতা লিখে পাওয়া পারিশ্রমিক আর একাডেমির কাজ থেকে পাওয়া অর্থে তাঁর সংসার চলছে না, তখন অর্থাৎ সেই ১৯৬১ সালে তিনি ফিলিপস রেডিও কোম্পানিতে চাকরি নিলেন। অসুস্থ পিতার চিকিৎসা, দুই ভাইয়ের পড়াশোনা এবং সংসার নির্বাহের সমুদয় দায়িত্ব তিনি তুলে নিলেন কাঁধে। দায়িত্ব বহন করা তাঁর কাছে ছিল রীতিমতো গর্বের বিষয়। শহিদ কবি মেহেরুন্নেসা সম্পর্কে তাঁর বন্ধু অধ্যাপক হাফিজা বেগম জানান, "কবি মেহেরুন্নেসার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় লেখালেখির মাধ্যমে। সত্তর দশকের কথা। আমরা তখন উত্তর বাসাবোতে থাকতাম। ওই এলাকা এবং তার আশপাশে তখন অনেক খ্যাতনামা লেখক-কবি থাকতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পল্লীকবি জসীমউদ্দীন, ড. মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, 'পয়গাম' পত্রিকার সম্পাদক মুজিবুর রহমান খাঁ, কবি ইজাবউদ্দিন আহমেদ, ইত্তেফাক পত্রিকার বার্তা সম্পাদক আসাফউদ্দৌলা রেজা প্রমুখ। তাঁরা সবাই মিলে একটি সাহিত্য সংগঠন করেছিলেন। আমরা উঠতি লেখক-লেখিকারা সেখানে লেখা পড়তে যেতাম। একবার সেখানে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল। কবি মেহেরুন্নেসা সেখানে কবিতা পড়তে এসেছিলেন। সেই সুবাদেই মেহেরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। যখনই দেখেছি তাঁকে দু'খানা শাড়িই পাল্টপাল্টি করে পরতে দেখেছি।

যে বয়সে মেয়েরা রঙচঙে পোশাক পরে রোমান্টিক মানসিকতায় দোল খায়, কবি মেহেরুন্নেসা তখন পরিবারের অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় প্রাণান্ত ব্যস্ত। কোনো কিছুতেই তিনি ভেঙে পড়তেন না। সব কিছুতেই তিনি ছিলেন আশুতোষ। এসব ঘটনা এখনও আমার স্মৃতিকে নাড়া দেয়। কবি ইজাবউদ্দিনের মুখেই আমি তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনেছিলাম। এখনও মনে আছে, তিনি বলেছিলেন আমাদের মেহের সপরিবারে মারা গিয়েছে। তখন আমরা ছোট-বড় সব সাহিত্যিক একই পরিবারের সদস্য ছিলাম। সেদিন বড়ই কেঁদেছিলাম—পরম আত্মীয়ের জন্যও মানুষ এত বেশি হয়তো কাঁদে না।"

১৯৭১ সালে ২৭ মার্চ অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্তও ৬ নম্বর মিরপুর সেকশনের বাড়িতে, তাঁর দুই ভাই এবং মাসহ থাকতেন। এই চারটি প্রাণী একসঙ্গে নিহত হন। সপরিবারে তাঁর এই মৃত্যুর জন্য দায়ী তাঁর আপসহীন সত্তা। সহজ-সরল মেহের সত্যের দুয়ারে বিবেকের তলোয়ার উঁচিয়ে দাঁড়াতে শিখেছিলেন। অনুসন্ধানী তৎপরতা চালিয়ে তার মৃত্যু-নেপথ্যের যে কারণটি জানা গেছে, এখানে পেশ করা হচ্ছে তার বিবরণ—

'ঘটনাটি ঘটেছিল কবির মৃত্যুর চারদিন আগে। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের ব্যাপার নিয়ে মিরপুর অবাঙালিদের সাথে বাঙালিদের বচসা হয়। অবাঙালিরা স্বভাবতই পাকিস্তানপন্থি। বাংলাদেশ স্বাধীন হোক, এ তারা চায় না। এই চাওয়া না চাওয়ার

কোন্দল শেষ পর্যন্ত গোলাগুলির পর্যায়ে চলে যায়। ১৯৭১-এর ২৩ মার্চ রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে সেই বিভীষিকাময় অবস্থা। ২৪ মার্চ মেহেরুন্নেসা তাঁর বান্ধবী কাজী রোজীর বাসায় আসেন রাতের ভয়াবহ সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে। কিন্তু কাজী রোজীর তখন খুব বেশি জ্বর থাকায় মেহের নিজেই এলাকার শান্তিরক্ষার অনুকূলে লিখিত একখানা দরখাস্ত নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বাড়িতে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ নেতা তাজুদ্দিন সাহেবকে বাড়িতে পান এবং তাঁরই কাছে দরখাস্তটি পেশ করেন। ফলে ২৫ মার্চ সকালে তৎকালীন এম. সি. এ. ড. মোশাররফ হোসেন সাহেব এসেছিল মিরপুরে স্থানীয় বি. এম. সি. মেম্বারের সাথে একটা বোঝাপড়া করতে। কিন্তু অবাঙালিরা তখন দারুণ ক্ষুব্ধ। ফলে ব্যাপারটার ফয়সালা তেমন কিছু হয়নি। আর হয়নি বলেই মেহেরুন্নেসার জীবনে নেমে আসে এই বিপর্যয়। জানা যায় ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বিহারিরা ছুরিকাহত করে মেহেরুন্নেসা এবং তাঁর দুই ভাইকে তাঁদের মায়ের সামনেই হত্যা করে এবং দেহ থেকে আলাদা করে তারা মেহেরুন্নেসার মাথাটি ঝুলিয়ে রেখেছিল কাপড় শুকানোর দড়িতে।

এই ভাবেই নিভে যায় বাংলার এক সূর্য কন্যার জীবন-প্রদীপ।

শহিদ মিলি চৌধুরী

পুরো নাম : কাজী মিশওয়াত নাহার
জন্ম : ১৯৩৩
মৃত্যু : ৭ এপ্রিল, ১৯৭১
মা : সালেহা বেগম
বাবা : কাজী মোঃ ইলিয়াস
স্বামী : ভিকু চৌধুরী
ডাকনাম : মিলি
জন্মস্থান : রংপুর
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী

রংপুর শহরের সে সময়ের প্রগতিশীল পরিবারগুলোর একটি ছিল কাজী পরিবার। এই পরিবারের বড় ছেলে কাজী মোঃ ইলিয়াস এবং সালেহা বেগমের প্রথম সন্তান কাজী মিশওয়াত নাহার। পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোকজনের কাছে 'মিলি' নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। তাঁকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন ছিল তাদের পরিবারের সবার। তিন ভাই সাত বোনের মধ্যে সবার বড় মিলি সেই সময়েই সাইকেল চালাতেন। পরিবারের তরফ থেকে কখনও কোনো ধরনের বাধা আসা তো দূরের কথা, বরং উৎসাহই দেয়া হয়েছে বেশি। খুব ভালো গান করতেন ছোটবেলা থেকেই। রংপুরের মানসী দে, টেপাই দি'র কাছে গান শিখেছেন। পড়েছেন কারমাইকেল কলেজে। রংপুর শহরে মনসনিয়া পুলের কাছে একটি বড় বটগাছ ছিল। সেখানে মাঝে-মধ্যে আসর বসত কীর্তনের। আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠতে থাকেন মিলি চৌধুরী। লম্বায় পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চি। শ্যামলা মিষ্টি মেয়ে হিসেবেই তাঁর পরিচিতি তৈরি হয়।

১৯৫০ সালে তাঁকে নিয়ে পরিবারের সদস্যদের দেখা স্বপ্নে কিছুটা ভাটা পড়ে। তাঁর বিয়ে হয়ে যায় ফুপাতো ভাই ভিকু চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান। রাজনীতির সঙ্গে মিলি জড়িত হন সেই ১৯৪৭ সালে কারমাইকেল কলেজে পড়ার সময় থেকেই। ১৯৫২ সালে ঘটে তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়ান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে। সে সময় রংপুর শহরে যত মিটিং-মিছিল হতো সেগুলোর মধ্যমণি ছিলেন মিলি চৌধুরী। রংপুর শহরে অনুষ্ঠিত কোনো মিছিলে নারীর অংশগ্রহণ তেমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। এরই পুরস্কারস্বরূপ জারি করা হলো তাঁর নামে হুলিয়া। তিনি তখন গ্রামবাংলার পথে পথে

ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছেন।

১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ওই দলের হয়েই কাজ করেছেন। রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে তিনি ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে ৯২ ক-ধারায় গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি শুরু করেন নতুন উদ্যমে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে রংপুর থেকে তিনি যোগদান করেন। ওই সম্মেলনের সাফল্যের জন্য তিনি প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেছেন।

৫৮ সালে মিলি চৌধুরী রংপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে প্রথমে ওঠেন আসাদ গেট কলোনিতে বোনের বাসায়। ষাটের দশকে তিনি যোগ দেন আওয়ামী লীগে। সে সময় থেকেই তিনি আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, দলের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা, মিটিং-মিছিল ইত্যাদিতে অংশ নিতেন।

তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চাচাতো বোন কাজী মদিনা জানান, "আমার বোন মিলি আপার খুব সুন্দর গানের গলা ছিল। 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ' গানটি ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। ঢাকায় যখন ওরা ১৯৬২ সালে স্থায়ীভাবে এলো, তখন বুবু ছায়ানটে ভর্তি হয়ে গেল। আমরা যদি ঠাট্টা করে বলতাম, এখন গান শিখে কি হবে? ও বলতো গানের কি বয়েস আছে? গান হলো সব বয়সের, সর্বকালের। ওর গলাটা ছিল খুব মিষ্টি আর যখন তানপুরা নিয়ে গান গাইতে বসতো, তখন ওর সেই শান্ত ঋজু বলিষ্ঠ চেহারায় এমন একটা মাধুর্য ফুটে উঠতো, যা ভোলবার নয়।"

"তিনি ফুল খুব পছন্দ করতেন। সেই সময় ১০০ টাকার ফুলের চারা কিনে তিনি আসাদ গেটে কলোনিতে বাগান করেছিলেন। ভর্তি হয়েছিলেন ছায়ানটে গান শেখার জন্যে। খুবই শান্ত ছিলেন আপা। কখনও জোরে কথা বলতে তাকে শুনিনি। অন্যদিকে তাঁর স্বামী ভিকু ভাই খুব হৈচৈ পছন্দ করতেন।

"যখনই কোনো আন্দোলন হয়েছে তখন ওঁকে দেখেছি কিভাবে চলমান আন্দোলনকে সাহায্য করা যায় তার জন্য সব সময় চালাতেন অক্লান্ত প্রচেষ্টা। ও বলতো, 'আমি নাম চাই না, কাজ চাই। কাজই আমার জীবন।' আর সেজন্যই নির্বাচনের সময় ওঁকে দেখেছি কী কঠোর পরিশ্রমই না ও করেছে! উত্তরবঙ্গের সবগুলো জেলায় ও একাই নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছে।

নির্বাচনের পরবর্তীকালে রংপুরে মিছিলের ওপর যখন গুলি চালানো হলো তখন বুবুকে দেখেছি কী ভয়াবহ মন খারাপ করতে। ও বলেছে, এখনও কেন ওরা বুঝতে পারছে না জনগণের রায়ের কাছে কারো মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।"

"১৯৭১ সালের প্রথম দিকে তিনি রংপুর শহরে ছিলেন। সেখানেই তিনি সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতির জন্য কাজ করতে থাকেন। সেখানে অতিরিক্ত

কাজের চাপ এবং রাজনৈতিক কারণে ছোটাছুটির ফলে মার্চ মাসের মাঝামাঝি তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ১৯ মার্চ তাঁকে স্ট্রেচারে করে রংপুর থেকে ঢাকায় আনা হয়। ঢাকায় আসার পর শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা। কিছুটা সুস্থ হলেও ছিলেন কিন্তু খুবই দুর্বল। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা যখন ক্র্যাক ডাউন হয়, সেই রাতেই এগারোটার দিকে তিনি আমাদের বাসায় ফোন করেন। ঢাকা শহরের পরিস্থিতি তিনি যতটুকু শুনেছেন তা জানান এবং আমাদের কাছ থেকেও জানার চেষ্টা করেন। তখন তাঁরা থাকতেন মোহাম্মদপুর কলোনিতে। যেহেতু আমার বাবা কাজী মোঃ ইদ্রিস ছিলেন সাংবাদিক, তাই আমাদের কাছ থেকে তথ্য জানার জন্য ঘন ঘন ফোন করতেন তিনি। এর মধ্যেই আরেক জনের ফোন মারফত জানলাম বঙ্গবন্ধু নাকি বন্দি হয়েছেন। এই খবর পেয়ে মিলি আপারা দারুণ অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন বাজে রাত দুটো। এর পরপরই এবং সঙ্গে সঙ্গে ফোনের লাইনও কেটে গেল। সেই ছিল আমার প্রিয় বুবুর সঙ্গে আমার শেষ কথা। ২৭ মার্চ কারফিউ ওঠার সাথে সাথে ওরা গেলেন ধানমন্ডিতে।

"এরপর থেকে তাঁরা ভারতে চলে যাবার জন্য মনস্থির করে ফেলেন। ভেবেছিলেন ওখানে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করবেন। তাঁদের তখন তিন ছেলেমেয়ে। বড় ছেলে রুবেল তখন কলেজে পড়ছে। তাঁকে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরিকল্পনা মতো ৩১ মার্চ ভিকু ভাইয়ের এক বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার জাহাঙ্গীর, ভিকু ভাই, মিলি আপা এবং তাঁদের দুই মেয়ে ইয়েন ও লিরাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন তাঁরা সীমান্তের উদ্দেশে।

"প্রথমে তাঁরা রওয়ানা হন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের পাকুল্লা গ্রামের উদ্দেশে। তিন তারিখে তাঁরা ভারতে যাবেন বলে সেখানে থাকতে থাকেন। তিন তারিখ অর্থাৎ যেদিন তাঁরা ভারতে যাবেন বলে ঠিক করেছেন, সকাল সাড়ে সাতটায় তাঁরা যখন খেতে বসেছেন, তখনই তাঁরা গুলির আওয়াজ শুনতে পান। ভিকু ভাই চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, 'সর্বনাশ হলো না তো?' ওঁরা বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেও আবার ফিরে আসেন সঙ্গে সঙ্গে, যখন গ্রামবাসীরা জানায় মিলিটারিরা গ্রামটি ঘিরে ফেলেছে। সত্যিই তাই। মিলিটারিরা এবার তাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে। এই অবস্থায় দুটো মেয়েকে নিয়ে বুবু এবং অন্যরা একটি ডোবার মধ্যে আশ্রয় নেন।

"প্রথমে তারা গুলি করল ভিকু ভাইকে। তারপর মিলি আপাকে। ওঁদের ছোট মেয়ে ইয়েন বলছিল, 'খালামণি, ওরা যখন আব্বাকে গুলি করেছে আব্বা তখন কেবল আমাদের নাম ধরে চিৎকার করেছেন।' আবার লিরা বলেছে, 'মামণির গায়ে মাত্র একটা গুলি লাগল, তবুও মা কেন মরে গেল?' বুবু যাওয়ার সময় ওদের বলেছে, 'তোরা বেঁচে থাকিস। বাংলাকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলাম, পারলাম না। আমি না দেখলেও তোরা দেখিস। তোরাই আমার কর্ম।' জাহাঙ্গীর ভাই ডোবাতে লুকিয়ে পড়েন। সেখান থেকে যখন দেখল ভিকু ভাইকে গুলি করছে, তখন তিনি পাকসেনাদের কষে গাল দেন, সাথে সাথে তাকেও গুলি করে মারা হয়। এসব ঘটে লিরা এবং ইয়েনের চোখের সামনে। ওরা তখন খুব ছোট। মিলি আপা তখন যেহেতু খুব অসুস্থ

ছিলেন তাই গুলি খেয়ে মরে যাবার পরও তাঁর দেহ থেকে খুব একটা রক্ত বের হয়নি। তাই লিরা ভেবেছে ওর মা মারা যায়নি। সেই অবস্থায় লিরা এবং ইয়েন সেখানে বসে থাকে বিকেল পর্যন্ত। এদিন ঐ গ্রামের মোট ১২৮ জনকে মারা হয় এবং জাহাঙ্গীর ভাইয়ের বাসা থেকে মিলি আপা এবং ভিকু ভাইসহ মোট সাতজন প্রাণ হারান।

"বিকেলের দিকে রহিম নামের একটি বাচ্চা ছেলে সাইকেলে করে ঐদিকে যাচ্ছিল। বাচ্চারা তখন তাঁকে এই ঘটনা বলে। জানি না অতটুকু বাচ্চাদের মনে কোথা থেকে এত সাহস ভর করেছিল! পরে রহিম বাচ্চাদের নিয়ে মির্জাপুর চলে আসেন। বাচ্চাদের একটি স্কুলে রাখা হয় এবং পরে রাতে ফিরে গিয়ে অন্যদের সহযোগিতায় খুবই আতঙ্কের মধ্য দিয়ে লাশগুলো দাফন করেন। কেননা, তখনও পাক আর্মির আবারও ফিরে আসার ভয় ছিল। তোজাম্মেল হোসেন নামের এক ভদ্রলোকের কাছে আমরা প্রথম মিলি আপা এবং দুলাভাইয়ের এই মর্মান্তিক শাহাদাত বরণের খবর শুনতে পাই। তারপর আমার ভাই কাজী মিশু ১৭ এপ্রিল সেখানে যান এবং একটি স্কুল থেকে বাচ্চাদের নিয়ে আসেন।"

শহিদ সুরবালা সরকার

জন্ম : ১৯১১
পিতা : এজেন্দ্রনাথ সরকার
মৃত্যুর তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ১৯৭১
স্বামী : বিধুভূষণ সরকার
পরিবারে অবস্থান : দুই ভাই দুই বোনের মধ্যে দ্বিতীয়
বাড়ি : উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, পাবনা
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তান সেনাবাহিনী

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী দিনাজপুর শহরে আক্রমণ চালায়। তাদের একটা বড় দল সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে বিনা বাধায় ভুষিরবন্দর-রামডুবি হয়ে চেহেলগাজি এসে গোলাগুলি শুরু করে। চেহেলগাজি শহরের খুবই কাছাকাছি। তাদের অপর আরেকটি গ্রুপ রাজবাড়ি হয়ে দিনাজপুর শহরে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানিদের তৃতীয় গ্রুপটি পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী, আমবাড়ি-মোহনপুর হয়ে দিনাজপুর শহরে আক্রমণ শুরু করে। এভাবে পাকিস্তানি পদাতিক বাহিনীর তিনটি বড় দল একত্রে দিনাজপুর শহরের ওপর আক্রমণ চালায়। সৈয়দপুর থেকে দিনাজপুর আসার পথে মানুষজনের মধ্যে প্যানিক সৃষ্টি করার জন্য তারা পথের দু'ধারের গ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাকিস্তানি পদাতিক বাহিনীর তৃতীয় গ্রুপটি মোহনপুরে বাধার সম্মুখীন হয়। মোহনপুর বিওপির ই.পি.আর. এবং স্থানীয় মুজাহিদরা পাকিস্তানি বাহিনীকে বাধা দিলে সেখানে একটা ছোটখাটো যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানিরা সংখ্যায় এবং অস্ত্রশস্ত্রে বেশ শক্তিশালী ছিল। ফলে ই.পি.আর. এবং মুজাহিদরা সেখানে পাকিস্তানিদের বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। তারা পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান বাহিনী মোহনপুরে বেশ কিছু লোককে হত্যা করে এবং বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আবার দিনাজপুরের দিকে অগ্রসর হয়।[১]

সে দিনই বড় বন্দরের নিজের বাড়িতে শহিদ হন সুরবালা সরকার। লেখাপড়া করেছেন মাত্র সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। ওই সময়ই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ার এজেন্দ্রনাথ সরকারের মেয়ে সুরবালা দিনাজপুরের বড় বন্দরে স্বামীর সংসারে থাকতেন। তাঁর স্বামী বিধুভূষণ সরকার ছিলেন দিনাজপুরের দারোগা। যুদ্ধের

১ মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের সাক্ষাৎকার, প্রকাশিত হয়েছে সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত 'মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর', মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪।

কিছুকাল আগেই তিনি মারা যান। সুরবালা ছিলেন ছয় ছেলে, তিন কন্যা সন্তানের জননী। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি।

যেদিন দিনাজপুরে পাক আর্মি আসে, সেদিন সুরবালার তিন ছেলে ঘরেই ছিল। বেলা তখন দুপুর বারোটা। ঘরে ঢুকল চৌদ্দ-পনের জনের পাকসেনা সদস্যের একটা দল। মার্চের শেষের দিক থেকে সৈয়দপুরে এবং মার্চের ১১ তারিখে দিনাজপুরে বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই পাকিস্তানিরা দিনাজপুরে আঘাত করে এবং শিয়ালগাজি আনসার ক্যাম্পে ঘাঁটি গেড়ে বসে। অন্য একটি গ্রুপ শহরের কুট্টাড়ীতে এসে তাদের অবস্থান সংহত করে। অনেক মানুষ তখন ভারতের পথে পাড়ি দেয়া শুরু করেছিল– কেউবা প্রাণের ভয়ে বাঁচার তাগিদে, কেউবা ভারতে ট্রেনিং নেয়ার জন্যে।

সে কারণে তখন শহরে লোক বেশি ছিল না। সেদিন শহরে ঢুকেই তারা প্রথমে শহরের হিন্দু বাড়িগুলোর ওপর চড়াও হয়। শুরু করে নির্বিচার নির্যাতন। সুরবালা সরকার তখন প্যারালাইজড ছিলেন। তিনি সারাদিন ঘরেই শুয়ে থাকতেন, এ-ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না। সেদিন বেলা বারোটায় পাকসেনাদের ভয়ে আশেপাশের মানুষজন যখন ছুটোছুটি করছিলেন, তখন একা ভয়ে হিমকঠিন হয়ে নিজের ঘরেই শুয়েছিলেন সুরবালা সরকার। তাঁর ছেলেদের সবাই প্রাণের ভয়ে ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর কী ঘটেছিল, তাঁর ছেলেরা সে কথা বলতে পারে না। তাঁর এক ছেলে সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন, "আমরা সেই যে চলে গেলাম, আর ফিরে আসলাম না। ফিরে আসলাম দেশ স্বাধীন হওয়ার পর। ঘরে এসে দেখি ঘরের সব জিনিসপত্র লুটপাট হয়ে গিয়েছে। আমার মা ঘরের ভেতর নেই। আমাদের বারান্দায় তাঁর হাড়গোড় পাওয়া গেল। বুঝলাম, পাকসেনারা তাঁকে মেরে ফেলে রেখে গিয়েছে। আমার মা চলাফেরা করতে পারতেন না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতেন। তাঁর শরীরের ওপরের অংশ অবশ ছিল। তাই তাঁর হাড়গোড় যখন বারান্দায় পেলাম, তখন আর বুঝতে বাকি থাকল না যে, তাঁকে পাকিস্তানিরা মেরে ফেলেছে।

"পরে আমরা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে মাকে মেরে ফেলার বিভিন্ন তথ্য পাই এবং জানতে পারি যে সেদিন দুপুরেই মাকে গুলি করে হত্যা করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। পরে আমরা ধর্মীয় মতে মায়ের সৎকার করি।"

এভাবেই পাকিস্তান সেনাদের বন্দুকের গুলিতে শেষ হয়ে যায় একজন ষাট বছরের নারীর জীবন।

শহিদ ভ্রমর

জন্ম : ১৯৪৮
মৃত্যুর তারিখ : ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১
মা : গিনি
পেশা : চাকরি, টেলিগ্রাফ অফিস
বাবা : গোলাম কুদ্দুস
ঠিকানা : মিস্ত্রিপাড়া, সৈয়দপুর
পরিবারে অবস্থান : চার ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়
ঘাতকের পরিচয় : বিহারি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নেই এই দেশে বসবাসরত বিহারিদের হাতে প্রাণ যায় অনেক বাঙালির। তবে সব বিহারিই যে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা নয়। মার্চের শেষাশেষি এবং পুরো এপ্রিল জুড়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘটতে থাকে বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে রক্তাক্ত দ্বন্দ্ব, সংঘাত। শেষ পর্যন্ত কোথাও কোথাও হত্যাযজ্ঞে পর্যন্ত গড়ায়। সেই ঘটনারই বলি হন সৈয়দপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রিয় মুখ ভ্রমর।

ছয় সদস্যের এই পরিবারটি সৈয়দপুর রেলওয়ে কলোনি হিসেবে সেই সময় যা এখনকার মিস্ত্রিপাড়া হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানেই তাঁরা থাকতেন। এই রেলওয়ের অ্যাকাউন্টস বিভাগের হিসাবরক্ষক ছিলেন গোলাম কুদ্দুস। তাঁর বড় মেয়ের নাম ছিল কাজল, মেজ মেয়ের ভ্রমর, তৃতীয় মেয়ের কলি এবং একমাত্র ছেলের নাম ছিল রাজা। গোলাম কুদ্দুসের পরিবারের সবাই কম-বেশি সংস্কৃতিমনা ছিলেন। ছিলেন স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যমণি।

গোলাম কুদ্দুসের তিন মেয়ের মধ্যে ভ্রমর ছিলেন ব্যতিক্রম চরিত্রের। খুব ছোটবেলা থেকেই গান-বাজনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। বাবা গোলাম কুদ্দুস তেমন চাকুরে না হলেও ছেলে-মেয়েদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যারপরনাই উৎসাহ দিতেন। এইচ.এস.সি. পাস করে ভ্রমর চাকরি করতেন টেলিগ্রাফ অফিসে। সৈয়দপুরের এই পরিবারটিকে সবাই চিনত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় সম্পৃক্তির জন্য। এমনকি ২১ ফেব্রুয়ারি পালনের ক্ষেত্রেও এই পরিবারের ছিল একটি বিরাট ভূমিকা। এছাড়া বড়দিন উপলক্ষে উৎসবও পালন করা হতো এই মিস্ত্রি কলোনিতে, সেই উৎসবেরও আয়োজক ছিল এই পরিবার।

সে কারণেই কী না বলা মুশকিল বিহারিদের দীর্ঘদিনের টার্গেট ছিল এই পরিবারটি। এপ্রিলের মধ্যভাগে অর্থাৎ ১৪ এপ্রিল প্রথম যে তিনটি পরিবারের ওপর বিহারিরা আঘাত হানে তাঁদের মধ্যে ছিল ভ্রমরদের পরিবারও। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী বিহারিরা যখন এই এলাকায় আসে, তখন সন্ধ্যা। বাসায় তখন সবাই ছিল। বিহারিদের মধ্যে প্রথম দশ-পনেরো জন ঢোকে আমজাদ সাহেবের বাসায়। সেখানে হত্যা করেন তাঁর স্ত্রী এবং কাজের মেয়েকে। এই এলাকায় আরেকজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, তিনি হলেন আতিয়ার। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এই এলাকার নাম হয়েছে আতিয়ার কলোনি।

বিহারিদের চোখে শহিদ ভ্রমরের আরও কিছু অপরাধ ছিল। তাদের পুরো পরিবার সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেছিল। তাঁরা বাংলা গান করতেন এবং গান শেখাতেন। ভ্রমর মফস্বলের মেয়ে হলেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাচতেন। বিহারিরা এটা সহ্য করতে পারত না। তাই প্রথম দফাতেই তারা আঘাত হানে ভ্রমরদের বাড়ির ওপর।

সেই দিনকার অভিজ্ঞতার কথা বলেতে গিয়ে ভ্রমরের প্রতিবেশী সারা বেগম (মুক্তিযুদ্ধের সময় যাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর) বলেন, "সেই গোলগাল চেহারার মিষ্টি মেয়েটি, এখনও তাঁর মুখটি চোখে ভাসে, যেই বিহারিরা আসলো, ভ্রমর বাঁচার জন্য প্রথমে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করল, আমরা জানালার ছিদ্র দিয়ে দেখছিলাম, কিন্তু ওদের ভয়ে কেউই বের হচ্ছিল না। ভ্রমর দৌড়াতে দৌড়াতে আমার ঘরের কাছে একটি ঘরে আসলো। এই বাসাটিও ছিল অবাঙালি বিহারিদের। সেই পরিবারের একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল ভ্রমরের। ভ্রমর বাঁচার জন্য প্রথমে সেই মেয়ের বাসায় গেল। মেয়েটি তাঁকে বাথরুমে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু সেখান থেকে বিহারি দুর্বৃত্তরা টেনে-হিঁচড়ে বের করে নিয়ে গেল বাইরে।

প্রথমে ভ্রমর লুকাল একটি গাছের আড়ালে। সেখান থেকেও তাঁকে টেনে বের করা হলো। নিজেকে বাঁচানোর জন্য এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছিল সে বেশ দীর্ঘক্ষণ ধরেই। বিশেষ করে আমাদের এখানে একটি চত্বর ছিল, যেখানে গান-বাজনা হতো, সেখানেই, সেই চত্বরের চারপাশ ঘুরে ঘুরেই সে বাঁচার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পারল না। এর মধ্যেই তারা ভ্রমরের বাবা আর মাকে মেরে ফেলেছে। ভ্রমরের বড় বোন কাজল সেদিন বাড়িতে ছিল না।

এই রকম ঘণ্টা আধেক ধরেই চলল। শেষমেশ ভ্রমর তাঁদের বাড়ির কাছে একটি আম গাছের পেছনে লুকাল। কিন্তু সেখানেই তাঁকে বেয়োনেট এবং বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করল বিহারিরা। তাঁর ছোট বোন কলিকেও সেই আম গাছের সঙ্গে আছড়ে মেরেছিল। সেখানেই শেষ হলো না সেই নারকীয় যজ্ঞের। তাঁর লাশ নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল বিহারিরা। বল্লমের আগায় ভ্রমরের লাশ গেঁথে বিভিন্ন এলাকার রাস্তাঘাট প্রদক্ষিণ করা হলো। পরে ট্রাকে করে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো সে ব্যাপারে আমরা আর কিছুই জানতে পারিনি। এভাবেই হারিয়ে গেল ফুটফুটে সেই সোনার মেয়েটি।"

শহিদ সুফিয়া খাতুন

জন্ম ১৯২৬
মৃত্যু ১৪ এপ্রিল, ১৯৭১
মা : রাবেয়া খাতুন
পিতা : মুন্সী মকবুল আহমেদ
স্বামী মোঃ আমজাদ হোসেন
পরিবারে অবস্থান : নয় ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়
জন্মস্থান : সূর্যনগর গ্রাম, পাংসা থানা, রাজবাড়ি
পারিবারিক নাম সুধা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের একেবারে শুরুতেই যাঁদেরকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, তাঁদেরই একজন সুফিয়া খাতুন। জোতদার বাবা মুন্সি মকবুল আহমেদ এবং মা রাবেয়া খাতুনের নয় ছেলেমেয়ের মধ্যে দ্বিতীয় এই সুফিয়া খাতুন। পরিবারের সবাই তাঁকে আদর করে ডাকতেন সুধা বলে। রাজবাড়ির পানশা থানার সূর্যনগর গ্রামে সুধা জন্মগ্রহণ করেন ১৯২৬ সালে। ভাই-বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ধীরস্থির এই সুধার গ্রামেই কাটে শৈশবের সোনালি দিনগুলো। গ্রামের স্কুলেই তিনি সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন।

জোতদার পরিবারের মেয়ে সুধার বিয়ে হয় মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার ভাগ্যকূল গ্রামে। স্বামী আমজাদ হোসেন ছিলেন রেলওয়ের অ্যাকাউনটেন্ট। স্বামীর সঙ্গে সুফিয়া থাকতেন সৈয়দপুর রেলওয়ে কলোনি, যেটি সে সময় মিস্ত্রি কলোনি হিসেবে পরিচিত ছিল। ছোটবেলা থেকেই সুধার ছিল পড়াশোনার অসম্ভব আগ্রহ। তাই স্বামীর ঘরে এসেও রেলওয়ে কলোনির মোস্তফা ইনস্টিটিউটের বেশিরভাগ বই-ই তাঁর পড়া হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত। তাঁর ছেলে মুরাদ হোসেন মায়ের কথা বলতে গিয়ে বলেন, "আমি ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলাম, পড়াশোনা করতে চাইতাম না। আমার মা আমাকে নিয়ে অর্থাৎ আমার পড়াশুনা নিয়ে খুব কষ্ট করেছেন। সব সময় খেয়াল রাখতেন আমাদের দুই ভাই-বোনের পড়াশুনার প্রতি। লাইব্রেরি থেকে মজার মজার বই নিয়ে আসতেন আমাদের জন্য। আমি বেশি পড়তে চাইতাম না বলে মার খুব দুঃখ ছিল। আমার এস.এস.সি. পরীক্ষার কারণেই মা এখানে থেকে গেলেন, বাবার কাছে গেলেন না। সে সময় যদি বাবার কাছে চলে যেতেন তাহলে হয়তো আমরা মাকে হারাতাম না।"

সুফিয়া খাতুনের বড় ছেলে মুরাদ হোসেন ১৯৭১ সালে ছিলেন এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। স্বামী আমজাদ হোসেন এর কিছুদিন আগেই বদলি হয়ে চলে যান পাকশীতে। সুফিয়া খাতুনেরও চলে যাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু ছেলের পরীক্ষার কথা ভেবে তিনি এবং তাঁর আরেক সন্তান মেয়ে ইভা সৈয়দপুরেই থেকে যান। এর মধ্যেই তাঁর ছেলে মুরাদ হোসেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে। সত্তরের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করেন এবং বিভিন্ন মিটিং-মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। হয়তো সে কারণেই এই পরিবারের প্রতি বিহারিদের ক্ষোভ ছিল।

১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল ঘটে সেই মর্মান্তিক ঘটনা। এর আগে শান্তাহারে বাঙালি এবং বিহারিদের মধ্যে তুমুল গোলযোগের ঘটনা ঘটে। সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালে অনেক বিহারি আহত অবস্থায় আসে এবং কাঞ্চন নদীতেও ভেসে যায় বেশ কিছু বিহারির লাশ। এসব দেখে-শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সৈয়দপুরের বিহারিরা। যেহেতু সৈয়দপুর ছিল তখন বিহারি অধ্যুষিত এলাকা, তাই তারা সহজেই একজোট হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের মত্ততায় মেতে ওঠে। প্রথম তারা টার্গেট করে লোকজনের বাসা, যাদের ওপর ছিল তাদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ।

এ রকমের মতলব নিয়েই ঢুকে পড়ে সেদিন তারা রেলওয়ে কলোনিতে। প্রথমেই তারা ঢোকে আমজাদ সাহেবের বাসায়। তখন মাগরিব এবং এশার আজানের মধ্যবর্তী সময়। ঘরে তখন সুফিয়া খাতুন কোরান শরিফ পড়ছিলেন। সেখানে ঢুকেই তারা তাঁর ছেলের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে থাকে এবং ছুরি দিয়ে সুফিয়া খাতুনকে আঘাত করে। সুফিয়া খাতুন সেই কোরান শরীফের উপরই ঢলে পড়েন। তাঁকে ছুরি মারতে দেখে এগিয়ে আসে ঘরের কাজের সাহায্যকারী মেয়ে জোবেদা। তাকেও ছুরি দিয়ে আঘাত করে মারা হয়। এই সময় তাঁদের বাসায় আর কেউ ছিলেন না। কয়েকদিন আগে তাঁর ছোট ভাই এবং তাঁর স্ত্রী বাসায় এলে সুফিয়া খাতুন তাঁর মেয়ে ইভাকে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন বেড়িয়ে আসার জন্যে।

এই সুফিয়া খাতুনকে হত্যা করার পর তাঁর লাশ ট্রাকে করে নিয়ে যায় বিহারিরা। কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না। তবে দীর্ঘদিন তাঁর পড়া সেই কোরান শরিফটিতে রক্তের দাগ লেগে ছিল বলে এলাকাবাসী জানান। প্রতিবেশী সারা বেগম বলেন, "আমি সেই কোরান শরিফটি নিয়ে আসি এবং একদিন রোজার সময়ে সেটা পড়ার সময় কোরান শরিফের মধ্যে ১৭ আয়াতে এসে রক্তের দাগ দেখতে পাই। তারপর আমি সেই কোরান শরিফটি রেখে দিই। অনেক বছর পরে তাঁর মেয়ে এসে অন্য একটি কোরান শরিফ দিয়ে এই কোরান শরিফটি আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়। আমিও দিয়েছি এই ভেবে যে ওটা তো তাঁর মায়ের শেষ স্মৃতি। আমার চেয়ে ওর কাছে থাকাই ভালো।"

মা'র শহিদ হওয়া এবং তাঁর লাশটিও খুঁজে না পাওয়ার গভীর বেদনা নিয়ে এখনো বেঁচে আছেন শহীদ সুফিয়া খাতুনের দুই সন্তান মুরাদ এবং ইভা।

শহিদ হোসনে আখতার

জন্ম ১৯৩৪
মৃত্যু ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১
মা : নাম জানা যায়নি
বাবা : শামসুল হক মজুমদার
স্বামী : ফজলুর রহমান
ডাকনাম : বুলবুল
জন্মস্থান : লাউতলী গ্রাম, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
ঘাতকের পরিচয় : বিহারি

কোনো কোনো সত্যি ঘটনা এমনই যে তা রূপকথাকেও হার মানায়। এ রকম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে অসম্ভব সাহস লাগে। সে রকম একটি কঠিন গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া একটি চরিত্র শহিদ হোসনে আখতার। ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল তাঁর তিন ছেলে এবং স্বামীও শহিদ হন। তবে হোসনে আখতারকে বিহারিরা জীবন্ত কবর দেয়।

পরিবারের লোকজন ভালোবেসে তাঁকে ডাকতেন বুলবুল বলে। কুমিল্লা সন্দাইল হাইস্কুলের শিক্ষক শামছুল হক মজুমদারের বড় মেয়ে বুলবুল ছিলেন পরিবারের প্রত্যেকেরই অসম্ভব আদরের। যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন মেয়েদের পড়াশোনার অতটা প্রচলন না থাকলেও বুলবুল তাঁর স্বীয় মেধার পরিচয় দেন সেই ছোট্ট বয়সেই। তৃতীয় শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে মেধাবী ছাত্রী হিসেব পরিচিতি পান। কিন্তু খুব বেশিদূর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই তাঁর বিয়ে হয়ে যায় নোয়াখালী জেলার সেনবাগের ডুমুরিয়া গ্রামের যন্ত্র প্রকৌশলী বজলুর রহমানের সঙ্গে। আস্তে আস্তে তাঁদের পরিবারে ছয়টি নতুন মুখ যোগ হয়। দেখতে দেখতে সময়ের কাঁটা চলে আসে একাত্তরে। বুলবুলের স্বামী বজলুর রহমান তখন ছিলেন সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপের ঢালাইঘরের ইনচার্জ। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তাই সেখানেই অবস্থান করছিলেন তিনি।

১৯৭১ সালে তাঁরা যে শহরটিতে থাকতেন তার পুরোটাই ছিল বিহারি অধ্যুষিত শহর। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই সেখানে বিহারি এবং বাঙালিদের মধ্যকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। সেইসব দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শহিদ হোসনে আখতারের ছেলে সাইদুর রহমান বলেন, “মার্চের শেষের দিকে অথবা এপ্রিলের প্রথমদিকে আমাদের দোতলা বাড়ির বারান্দায় রেলিংয়ের বাইরে আর্থিংয়ের

পাইপে চিকন বাঁশের মাথায় বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয়েছিল আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে।"

"১৫ এপ্রিল হত্যাকাণ্ডের আগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্থানীয় বিহারিদের সাহায্যে আমাদের বাসায় তিন-তিনবার তল্লাশি চালায়। এসব তল্লাশির পর থেকে মা-বাবাকে প্রায়ই সবাই দেশের বাড়িতে বা অন্য চলে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আমার আম্মা মাঝে-মধ্যে বাবাকে বলতেন, 'তুমি না যাও কোথাও আমাদের অন্তত পাঠিয়ে দাও'। আমার মার জন্য কষ্ট হয়, বেচারি বাঁচার জন্যে কত চেষ্টাই না করছিলেন! আমাদের বড় আপা তখন ঢাকায় পড়তেন। সেই পনের তারিখের আগের দিন বড় আপাকে এসে চাচা-চাচি তাঁদের বাসায় নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের যাওয়া হলো না। বদ্ধ ঘরে আমার মা প্রায়ই কান্নাকাটি করতেন। আমার মা খুব ভালো সেলাই জানতেন। তিনি সেখানে সমাজকল্যাণ বিভাগের সেলাই প্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উর্দুভাষী কোনো সহকর্মী, ছাত্রী বা বান্ধবী এলে তাদেরকে কেঁদে কেঁদে তিনি বলতেন, "আমাদের যদি ওরা মেরেই ফেলে তাহলে সামনের দিক থেকে নয় পেছনের দিক থেকে যেন গুলি করে, ছুরি দিয়ে যেন হত্যা না করে।" হায়, আমার মা, যিনি মৃত্যু-যন্ত্রণাকে ভীষণ ভয় পেতেন বলে, ছুরি দিয়ে নয়, গুলি করে তাও আবার সামনে থেকে নয়, পেছন দিক থেকে গুলি করে মারার কথা বলতেন, সেই স্নেহময়ী মাকে পাকিস্তানি হায়েনাদের দোসর বিহারিরা বন্দুকের গুলি নয়, ছুরিকাঘাত করে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল।"

সাইদুর রহমানের ভাষায় সেদিনটি ছিল এ রকমের ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল। বাংলা নববর্ষের দিন। সকাল দশটার মধ্যে আম্মা নববর্ষের রান্না শেষ করেন। হঠাৎ শোরগোলের শব্দ। কিছু উত্তেজিত বিহারি আমাদের ঘরে প্রবেশ করল। এর আগে নাকি দিনাজপুরে বিহারি-বাঙালি সংঘর্ষে অনেক বিহারি মারা গিয়েছে। তাই ওরা এতটা উত্তেজিত। বিহারিগুলো ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে এবং কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে যায়। সেখানে তারা আমাদের না পেয়ে আবার নিচে নেমে আসে এবং নিচতলার মূল দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে। ভয়ার্ত আমরা তখন খাটের নিচে। সেগুন কাঠের বিরাট দরজা ওরা ধাক্কা দিয়ে ভাঙতে না পেরে শাবল না কি দিয়ে যেন দরজার দুই পাল্লার কব্জা ভেঙে ফেলে। আব্বা এটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ওদের উল্টো দিক দিয়ে দৌড়ে পালাতে যান। কিন্তু বড় রুম থেকে বারান্দায় দরজার সঙ্গে আব্বার পাঞ্জাবি আটকে গেলে ঘাতকরা বাবার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। আব্বা দরজার গা ঘেঁষে বসে পড়েন এবং সেভাবেই মারা যান। আমাদের মেজ ভাই হিরন আব্বার এই অবস্থা দেখে 'আব্বা' বলে চিৎকার দিয়ে খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে পড়লে ওরা ভাইকেও ছুরিকাঘাত করে এবং সেও লুটিয়ে পড়ে। এরপর ঘাতকেরা আমাদের অবস্থান জানতে পেরে আমাদেরকে খাটের নিচ থেকে বের হয়ে আসতে বলে।

"আমার আম্মা দু'হাত জোড় করে ভীষণ অনুনয়-বিনয় করে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, 'আমোদের মেরো না বাবা। আমরা তো কোনো অপরাধ করিনি। আমাদের

মাফ করে দাও। তোমাদের পায়ে ধরি।' এই বলে মা বিহারিদের পা ধরতে যায়। কিন্তু ঐ পাকিস্তানের প্রেতাত্মারা মার কোনো কথা না শুনে বরং মাকে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় উর্দুতে গালাগাল করতে থাকে এবং তাঁকে টেনে নিচতলায় ঢোকার সদ্য ভাঙা দরজা পার করে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এসেই ছুরি চালায়। প্রথম ছুরিটা আম্মার কোমরে টাকা রাখার ব্যাগে লাগে (মা সবসময় কিছু টাকা একটা পার্সে পেটিকোটের সঙ্গে কোমরে রাখতেন যদি তাৎক্ষণিকভাবে কোনো কাজে লাগে এই ভেবে)। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে আম্মার শাড়ি ছিঁড়ে কোমর থেকে ব্যাগটা খুলে নিয়ে আবারও ছুরি চালায়। মা মেঝেতে পড়ে যান এবং আহত অবস্থায় তিনি চিৎকার করে আমাদেরকে মারতে নিষেধ করতে থাকেন। এই অবস্থায় খুনিরা আমার মাকে টেনে-হিঁচড়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যায়। এই পর্যন্তই আমি দেখেছি। তারপর বাড়ির বাইরে গর্ত করে সারাক্ষণ মৃত্যুভয়ে ভীত আমাদের মাকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতে ফেলা হয়।"

এই ঘটনায় শহিদ হোসনে আখতারের তিন ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান মজনু, হাসিনুর রহমান হিরন, আজিজুর রহমান বাবু এবং তাঁর স্বামী বজলুর রহমান শহিদ হন। তাঁর তিন ছেলেকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়; কিন্তু পরে বিহারিরা খবর পেয়ে সেখান থেকে তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতনে নির্যাতনে মেরে ফেলে।

শহিদ সরোজিনী মল্লিক

ডাকনাম : সরো
পিতা : শান্তি পণ্ডিত
স্বামী : দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক
মৃত্যু : ১৫ এপিল ১৯৭১
জন্ম : ১৯২৪
অবস্থান : সাত ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়
পেশা : গৃহিণী
জন্মস্থান : বালুচরা গ্রাম, নদীয়া জেলা, পশ্চিমবঙ্গ
ঠিকানা : নতুন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী
ঘাতকের পরিচয় : বিহারি

ঘরের সামনেই একটা ছোট্ট গোল কুয়োর মতো; কিন্তু কুয়োর মুখটা বাঁধানো। কুয়োর ওপরে একটা ক্রস। নিচে লেখা 'মেমোরি অব ১৫ এপ্রিল ১৯৭১'।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে এদেশে বসবাসরত বিহারিদের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ শুরু হয়। তবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, সকল বিহারিই বাঙালি নিধনে অংশগ্রহণ করেননি। মার্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথম দিক থেকেই বিভিন্ন এলাকায় এই হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন পাকিস্তান সমর্থক বিহারিরা। সৈয়দপুরে এই তাণ্ডব শুরু হয় ১৫ এপ্রিল। এলাকাওয়ারি জারি থেকে জানা গেছে, এর আগের দিন শান্তাহারে বাঙালিদের সঙ্গে বিহারিদের সংঘর্ষে অনেক বিহারি হতাহত হলে তার জের হিসেবেই সৈয়দপুরেও বিহারিরা এ ধরনের প্রতিশোধাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উল্লিখিত সময়ে সৈয়দপুরে আশি শতাংশ মানুষই ছিলেন বিহারি। সেই পনের তারিখেই এক সন্তানের সঙ্গে শহিদ হন সরোজিনী মল্লিক। ভারতের নদীয়ার স্কুল শিক্ষক পিতা শান্তি পণ্ডিতের সাত ছেলে-মেয়ের মধ্যে সরোজিনী ছিলেন দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকেই শান্ত প্রকৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠা সরোজিনী পড়াশোনা করেছেন সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। শৈশব কেটেছে নদীয়াতে ভাই-বোনদের সঙ্গে এক উচ্ছল, অনাবিল ভালোবাসার বন্ধনগত পরিবেশে। এহেন সরোজিনী মল্লিকেরই বিয়ে হয় সৈয়দপুরের রেল ডিপার্টমেন্টে চাকরিরত দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিকের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকে তিনি বসবাস করছিলেন সৈয়দপুরে। ১৯৭১ সালে তিনি সাত সন্তানের জননী। থাকতেন এখানকার নতুন বাবুপাড়াতে। খুব ভালো সেলাই জানতেন সরোজিনী। ভালো ছাত্রী ছিলেন। সন্তানদের পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন বেশিরভাগ সময়।

সন্তানদের বিষয়ে তিনি অসম্ভব যত্নশীল ছিলেন।

সরোজিনীর প্রথম সন্তান আব্রাহাম মল্লিক তখন আই.এ. পড়ত। সে জড়িত ছিল ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে। এ জন্য বিহারিরা আগে থেকেই তাদের ওপর নাখোশ ছিল। ছোট ছেলে জ্যাকব পড়ত অষ্টম শ্রেণীতে। একাত্তরের ১৫ এপ্রিল সরোজিনী তাঁর এই দুই ছেলে আব্রাহাম ও জ্যাকবসহ শহিদ হন।

সরোজিনীর ঘরে বর্তমানে থাকেন তাঁর মেয়ে রেবা মল্লিক। সেই ট্র্যাজিক ১৫ এপ্রিলের ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "দুপুর বারোটার দিকের ঘটনা। দিনাজপুরে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় বিহারিরা ভয়ানকভাবে মার খায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিহারিরা পথে নেমে আসে এবং ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। সকাল থেকেই ছোটাছুটি হচ্ছিল। বাড়ির সবাই কখন কী হয় এই ভয়ে তটস্থ। আমি এবং মা চাল ঝাড়ছিলাম। মা আমাকে চলে যেতে বলছিলেন; কিন্তু আমি তখন একবার এ-ঘরে আরেকবার ও-ঘরে এইভাবে পায়চারি করছিলাম। আমার ভাই জ্যাকব তখন হাঁস-মুরগির জন্য চালা ঘরের মতো বানানোর চেষ্টা করছিল।

"আমার বড় ভাই আব্রাহামকে বিহারিরা এই সময় বাইরে থেকে অন্য একটি ছেলেসহ ধরে নিয়ে আসে এবং আমাদের পাশের একটি বাসায় এনে আটকে রাখে। বাইরে থেকে বিহারিরা তালা লাগিয়ে দেয়। প্রকাশ বিশ্বাস ও গিদিয়ন বিশ্বাস নামের দুইজন লোক বাইরে থেকে আব্রাহামকে বের হতে সাহায্য করে। ফলে আব্রাহাম এক সময় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু জানালা দিয়ে বের হওয়ার সময় বাড়িতে তাঁর মা-বাবা ও ভাই-বোনেরা কেমন আছে বা কী করছে, দেখার ইচ্ছে হয়। এই ইচ্ছে থেকেই বাড়িতে উঁকি দেয়ার মুহূর্তে বিহারিরা তাঁকে দেখতে পায়। বাড়িতে বিহারিরা তখন তার মা এবং ভাইকে ধরে মারছিল।

"আমরা মেয়েরা অর্থাৎ বোনেরা মায়ের অনেক অনুরোধে আগেই বাড়ি থেকে দূরে গিয়ে চার্চে আশ্রয় নিয়েছিলাম। মা ভেবেছিলেন, তিনি বয়সি মানুষ, তাকে আর বিহারিরা কি করবে? তিনি বাড়িতেই থেকে যান। এদিকে বাবা বাইরে থেকে বাড়ির দিকে আসছিলেন। আসার পথে শুনতে পান আমাদের বাড়িতে বিহারিরা আক্রমণ করেছে। তাই প্রতিবেশীরা বাবাকে বাড়িতে না যাবার পরামর্শ দেন এবং বাবাও চার্চে চলে আসেন।

"ওরা মা ও ভাইকে রামদা এবং তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। ভাইকে তারা প্রথমে জবাই করে আমাদের বাসার কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। আমার মা তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁকেও সেই কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। আমার বড় ভাই, যিনি প্রাণের ভয়ে ছুটে গিয়েছিলেন, তাকেও শেষ পর্যন্ত বিহারিরা ধরতে সক্ষম হয় এবং তাঁকে তারা মেরে বাইরে ফেলে রাখে। তাঁর লাশও আমরা পাইনি। আমার ভাই এবং জীবন্ত অবস্থায় মাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়ার ঘটনার সাক্ষী আমাদের প্রতিবেশীরা।

"আমরা পার্শ্ববর্তী চার্চে দিন কয়েক থাকি। এর মধ্যে বাসার কোনো খবর পাইনি। চার্চ থেকে বের হয়ে খোঁজ নেয়াটা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। সে সময়কার অবস্থা

আসলে বলে বোঝানো মুশকিল। কিছুদিন পর আমার আব্বা বের হলেন চার্চ থেকে। দেখলেন তাঁকে দেখা মাত্রই লোকজন কী যেন বলাবলি করছেন; কিন্তু তারা তাঁর সামনে আসলে থেমে যাচ্ছেন। বাবা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না।

"আমাদের একটা কুকুর ছিল। বাবা বাড়ি ফিরে আসার পর কুকুরটা বাবাকে বারবার কুয়োর কাছে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল এবং কুয়োর কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠছিল। বাবা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু কুকুরটা বারবার বাবার পরনের শার্ট এবং লুঙ্গি টেনে ধরে কুয়োর কাছে নিয়ে যাচ্ছিল এবং কুয়োর পাশে ভাইকে জবাই করার কারণে যেখানে অনেক রক্ত পড়েছিল। কুকুরটা সেদিকেও বাবাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। বাবা এই সব কিছু দেখে মুহূর্তে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন।

"পরে আমরা শুনতে পাই পুরো ঘটনা। বাড়ি ফিরে আসার পর বাবা লোক ডেকে সেই কুয়ো থেকে লাশগুলো উদ্ধারের চেষ্টা চালান। কিন্তু ততদিনে লাশগুলো পচে-গলে গিয়েছিল। লোকজনের পায়ে জড়িয়ে শুধু উঠে এসেছিল মায়ের মাথার কিছু চুল। বাবা পরে কুয়োটার মুখ বন্ধ করে দেন। তার ওপরেই আমরা স্মৃতিফলক স্থাপন করি।

"আজো এভাবেই আমরা বহন করছি আমার ভাইদের এবং মায়ের সেই কষ্টের স্মৃতি।"

শহিদ বাবনী রাজগৌড়

জন্ম : ১৯৪৬ (আনুমানিক)
স্বামী : গৌরা রাজগৌড়
স্থান : পাত্রখোলা চা বাগান
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী
পেশা : চা বাগানের শ্রমিক

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের চা বাগানগুলোতেও সংঘটিত হয়েছিল মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড। সীমান্ত এলাকার নারী চা-শ্রমিকরা কোথাও কোথাও গাইড হিসেবে কোথাওবা গোপন সংবাদ দিয়ে সাহায্য করতেন। ভৌগোলিক কারণে চা বাগানগুলো দেশের প্রায় পূর্বদিকে সীমান্তবর্তী হওয়ায় যুদ্ধের তীব্রতা ছিল প্রখর। তবে এর আগেই পূর্ব পাকিস্তানে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করতে থাকেন চা বাগানের শ্রমিকরা। বিশেষ করে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রে ছয়-দফা, এগারো দফার দাবিতে রাজপথ কেঁপে উঠলে পাহাড়ি টিলা জঙ্গল পেরিয়ে চা-শ্রমিকদের নিস্তরঙ্গ জীবনও তার আলোড়নে আলোড়িত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে সুরেন্দ্রচন্দ্র বুনরাজি, জয়চাঁদ বুনরাজি, পবনকুমার তাঁতী, মনোরঞ্জন বাড়াইক, বিমল বুনরাজি প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে সুলেমান-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইউনিয়নের ভেতরেই একটি বিকল্প নেতৃত্ব গড়ার চেষ্টা চালান।[১]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকার মনোনীত ইউনিয়ন নেতা এস. সুলেমান শ্রমিকদের জন্য তৈরি ও বরাদ্দ করা কুঁড়েঘরে প্রতি মাসিক সাড়ে ছয় টাকা করে ভাড়া ধার্য করলে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটে। চা-বাগানের বাইরের আন্দোলনের মুখে সামরিক সরকার নতি স্বীকার করতে শুরু করলে চা-শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের ১৩ এপ্রিল সমশেরনগর ফ্যাক্টরির সামনে এক প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর ওপর পুলিশ গুলি চালালে তাতে নীরা বাউরী নামের একজন চা-শ্রমিক প্রাণ হারালে পার্শ্ববর্তী বাগানগুলোতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই সময় বাগানের নানামুখী কালাকানুন উপেক্ষা করে মিটিং-মিছিল চলতে থাকে।

বস্তুত অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকেই চা বাগানগুলোতে মিটিং-মিছিল লেগেই ছিল। ব্যাংক ও রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক রেশন দেয়াও

---

১. মনোরঞ্জন বাড়াইক, লেবার হাউস, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। তাঁর এ সংক্রান্ত (লিখিত বক্তব্য), উল্লেখ করা হয়েছে দীপংকর মোহান্ত'র 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক' শীর্ষক গ্রন্থে, ২০০০, সাহিত্য প্রকাশ ।

কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। নিত্য উপবাসী শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের দাবি নিয়ে এ সময় দুই-একটি বাগানে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। এরই ফলে মার্চ মাসের দিকে দ্রুত পাল্টে যেতে থাকা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের মনোজগতে বৃহত্তর আন্দোলনের আবহ দানা বাঁধতে থাকে। আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে ওঠে যখন বাগানের সীমানার বাইরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা শ্রমিক বস্তির ভেতরে এসে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ফলে তাদের মধ্যকার আন্দোলনগত দূরত্বের পার্থক্যটুকু মুছে যায়। অন্যদিকে সেনারা চা বাগান সংলগ্ন সীমান্ত অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করলে শ্রমিকদের মধ্যে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলারও প্রস্তুতি চলতে থাকে ভেতরে-ভেতরে। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় কোনো কোনো বাগানে 'সংগ্রাম কমিটি' গঠনের তৎপরতাও উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায়।

২৫ মার্চের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের খবর শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনাকে যেন আরও শাণিত করে তোলে। বড়লেখা সীমান্তেও পাল্লাথল থেকে শ্রমিকরা লাঠিসোটা নিয়ে স্থানীয় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং ২৬ মার্চ তারিখেই শাহবাজপুর এসে প্রতিরোধব্যূহ রচনা করে। ২৬ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ২৭ মার্চ বেতার ভাষণযোগে তারই পুনরাবৃত্তি এবং গণহত্যা সংক্রান্ত খবরে উদ্বেলিত হয়ে পড়ে এখানকার শ্রমিকসমাজ। গুজব রটে যায়, পাকসেনারা হত্যাযজ্ঞ চালাতে চালাতে এদিকে আসছে, কারো আর রক্ষা নেই।. ফলে শ্রমিকরা নিজেদের মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। তাদের এ ধরনের তৎপরতার মধ্যে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা প্রদান, তাদের আশ্রয় দান, সময়মতো তথ্য প্রদান এবং চারিদিকে দৃষ্টি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের সাবধান করে দেয়া। মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে অবস্থিত অন্যতম বৃহৎ চা বাগান হলো পাত্রখোলা চা বাগান। সীমান্তবর্তী কুরমা, চম্পারায়, পাত্রখোলা, ধলাই এই ৪টি চা-বাগানে লড়াই সব সময় লেগে থাকত বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। ক্যাপ্টেন সাজ্জাদুর রহমানের পরিকল্পনায় এবং ই. পি. আর. হাবিলদার মোহাম্মদ শুকুরের নেতৃত্বে ৩১ জন মুক্তিযোদ্ধা গভীর রাতে বাগানে টহলরত পাকসেনাদের খুব কাছ থেকে আক্রমণ করলে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। এই যুদ্ধে পাকসেনারা পরাজিত হলেও মুক্তিযোদ্ধারা হারায় নজরুল ইসলাম নামের তাদের একজন সহযোদ্ধাকে।[২]

এই পাত্রখোলা চা বাগানেই পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে শহিদ হন স্বামী গৌড়া রাজগৌড়াসহ বাবনী রাজগৌড়। বাবনী রাজগৌড়ের স্বামী ছিলেন চা বাগানের শারীরিক শিক্ষা প্রশিক্ষক। আর বাবনী রাজগৌড় কাজ করতেন চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে। তাঁর স্বামীর শারীরিক প্রশিক্ষণের ট্রেনিং থাকায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন এবং তাঁকে রাজি করিয়ে ফেলেন তাঁদের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে। তাঁর স্বামীর সঙ্গে এ কাজে প্রায় দ্বিধাহীন চিত্তে যুক্ত হন বাবনী রাজগৌড়। তিনি তাঁর স্বামীর কাছে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খবর জিজ্ঞেস করতেন এবং সময় সময় একজনের সংবাদ অন্যজনের কাছে পৌঁছে দিতেন। এছাড়া চা বাগানের অন্যরা কে কী

২. দীপংকর মোহান্ত, 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক', ২০০০ , সাহিত্য প্রকাশ ।

করছে, সেই বিষয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের সময়-সময় তিনি সাবধান করে দিতেন। কে কাকে ফলো করছে, কার বিষয়ে কোথায় কী আলোচনা হচ্ছে চা বাগানের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি এসব তথ্যও সংগ্রহ করতেন। কিন্তু তাঁর এই গোপন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তৎপরতা বেশিদিন গোপন রাখা যায়নি। স্থানীয় রাজাকাররা ঠিকই তাঁর পেছনে লেগে যায়, শুরু করে গোয়েন্দাগিরি।

আর তাঁর স্বামী শুরু করে দেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ। কেবল প্রশিক্ষক হিসেবেই নয়, তিনি মনে-প্রাণেই রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। দুই দফা তাঁকে তাঁর স্ত্রী সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, 'একটু সমঝে চলো' কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি গৌড়া রাজগৌড়। এমনকি তাঁর ছোট দুই শিশু কন্যার দিকেও তখন তাঁর তেমন খেয়াল ছিল না। কিন্তু এমন জলজ্যান্ত ঘটনা কীভাবে চাপা থাকবে, কেননা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি তখন গড়ে উঠেছিল স্থানীয়ভাবে রাজাকার, আলবদর আর আলশামস বাহিনী। তারাও পাল্টা তথ্য সংগ্রহ জোগাড় করতে থাকে। পেয়েও যায়। ফলে তারা দেরি না করেই সেই খবর পৌঁছে দেয় হানাদার বাহিনীর কানে।

সে দিনের কাহিনী বলেছিলেন শহিদ পিতা-মাতার সন্তান পুতুল রাজগৌড়। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় কিংবা সাত বছর। তাঁরা দুই বোন তখন ঘরে বসে খেলছিলেন। ভরা বর্ষার মৌসুম। তারিখ কিংবা বার মনে নেই পুতুলের। বললেন, মনে থাকার মতো বয়েস তাঁর ছিল না। তবে ঘটনার সময়টা ছিল দুপুর। তাঁর মা তখন রান্না করছিলেন।

ঠিক এই সময় খাকি পোশাক পরা ৪ জন লোক বাসার সামনের দরজা ধরে ধাক্কাধাক্কি করতে শুরু করল। প্রথমে তাঁর বাবা মা দরজা খুলতে চাইল না। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে অশুভ কিছু। অবশেষে পাক বাহিনীর সদস্যদের বুটের ধাক্কায় চা বাগানের সেই শ্রমিকের ঘরের দরজা না ভেঙে উপায় কী? তারা তরতর করে ঘরে ঢুকে গেল। তারা প্রথমে তাঁর বাবার নাম জিজ্ঞেস করল। নাম শোনার পর পরই কিছু না বলেই তার বাবা মাকে চোখ বেঁধে নিয়ে গেল। তার এখনও মনে আছে, তার মা তখন কেবল চিৎকার করছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবা ছিলেন নির্বিকার। যেন আগে থেকেই তিনি তাঁর ভবিতব্য সম্পর্কে জানতেন। তারা দুই বোন মিলে ভীষণভাবে কান্নাকাটি করত লাগল। তাঁর মা সেই ঘাতকদের অনুরোধ করলেন তার মেয়ে দুটিকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। তিনি বললেন, আমাদের নিয়ে গেলে তো এদেরকে দেখার কেউ থাকবে না। কিন্তু তাতে পাক বাহিনীর সদস্যদের মন গলল না। উল্টো গালমন্দ শুরু হলো। তারা তাঁর মায়ের ঘাড়ে বন্দুকের নল দিয়ে আঘাত করে তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেলেন। এইভাবে সেদিন আর কতজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এখন আর সে কথা মনে করতে পারে না। কেননা তারা এত ভয় পেয়েছিল যে, ভালো করে কোনো কিছু লক্ষ করার মতো তাদের হুঁশ ছিল না। এর মধ্যেই তার বড় বোন, তার মায়ের হাত ধরে পেছনে পেছনে যেতে লাগল, কিন্তু পাক বাহিনীর লোকজন এক পর্যায়ে তাকে লাথি মেরে ফেলে দিল। ভয়ে অনেকক্ষণ তারা জড়োসড়ো হয়ে থাকল। প্রতিবেশীদের বাসা-বাড়িতেও যেতে পারেনি তখন। প্রতিবেশীরাও

আসতে পারেনি তাঁদের খোঁজ নিতে, কেননা তখন সবার মধ্যেই কাজ করছিল ভয়ানক আতঙ্ক।

তারপর তাঁর বাবা-মাকে কোথায় নিয়ে গেল তা তারা জানতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর তাঁর চাচা বাড়ি ফিরে ঘটনা জানতে পারেন এবং দুই বোনকে কান্নারত অবস্থায় দেখে বিষয়টি বুঝতে পারেন। অবুঝ বাচ্চা মেয়েদের কাছ থেকে আধো আধো ভাষায় তাদের বাবা-মার কথা জানতে পেরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাসায় রেখে যান মেয়ে দুটোকে। তারপর শুরু হয় হন্যে হয়ে তাঁদের বাবা-মাকে খোঁজার পালা। তিনি বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রীকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু কোথাও তাদের টিকিটিরও দেখা মিলল না। বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পান বিভিন্ন ধরনের তথ্য। একবার এদিকে যান তো আবার যান ওদিকে। এই সঙ্গে ভর করেছে মনে নিজের জীবনের প্রচণ্ড ভীতি।

এভাবেই কেটে যায় মাস খানেক। তারপর একদিন চা-বাগানের ভিতরেই তাদের চাচা এলাকার লোকদের মধ্যে এক ধরনের কানাঘুষা শুনতে পান এবং তারা তাকে তার ভাইয়ের সন্তানদের দায়িত্ব তাকে তার নিজের কাঁধে তুলে নিতে বলেন। ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে দুঃখ না করে ভবিষ্যতে কীভাবে ভাইয়ের বাচ্চাদের মানুষ করবেন, বলেন সে কথাও। ঠিক তখুনি, তাঁর চাচার সন্দেহ হয় যে, তার ভাই এবং ভাইয়ের স্ত্রীকে মেরে ফেলা হয়েছে। এরও অনেক পরে তাঁরা শুনতে পান আসল ঘটনা। জানতে পারেন তাঁর ভাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। কেননা, তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যকারী ট্রেনিংদাতা। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীর অপরাধ ছিল তিনি বিভিন্নভাবে স্বামীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছিলেন।

অনেক পরে পুতুল রাজগৌড় শুনেছেন, তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্রীমঙ্গল আর্মি হেড কোয়ার্টারে। তিনি শুনেছেন তাঁ বাবা-মা পানি খেতে চাইলে রাজাকাররা তাঁর বাবা-মাকে প্রস্রাব খাইয়েছে। এইভাবে দুই-তিনদিন অমানুষিক অত্যাচার করার পর বি.ডি.আর. ক্যাম্পের সামনের বটগাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁদের ব্রাশফায়ার করে মারা হয়। তারা মা-বাবার লাশ কখনও পাননি।

এরপর চাচার কাছেই মানুষ হতে থাকেন পুতুল এবং তার বোন। চাচাই তাদের আদর-যত্ন দিয়ে বড় করেছেন। এক সময় দুই বোনকে বিয়ে দেন। পুতুল রাজগৌড়ের স্বামী ছিলেন এই পাত্রখোলা চা বাগানেরই শ্রমিক। বছর দুই আগে ক্যান্সারে তার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং তার বোনটিও মারা যায় অসুখে। বর্তমানে চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে চা-বাগানে দৈনিক ২৮ টাকা মজুরিতে বহু কষ্টে-সৃষ্টে টিকে আছেন এই শহীদের সন্তান।

বাবনী রাজগৌড় কিংবা গৌড়া রাজগৌড়ের নাম শহিদ তালিকায় আছে কী-না, পুতুল সেটা জানে না। কেউ কখনও এ নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। তাঁর বড়বোন মারা গিয়েছেন প্রায় বিনা চিকিৎসায়। তাঁর বাবা-মার কোনো ছবিও নেই তাঁর কাছে। একদা চা বাগানে আগুন লাগলে নষ্ট হয়ে যায় তাঁর বাবা-মার শেষ স্মৃতি সম্পৃক্ত ছবিখানা।

এ ভাবেই ইতিহাসের অগোচরে রয়ে গিয়েছে বাবনী রাজগৌড় এবং তাঁর স্বামীর কথা।

শহিদ রাঙামা কুর্মি

জন্ম ১৯৪৬ (আনুমানিক)
স্বামী : লসিমুন কুর্মি
স্থান : ধলই চা বাগান
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী
পেশা : গৃহিণী

বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার একটি থানা কমলগঞ্জ। এই থানা বিখ্যাত বহু কারণে। তিরিশের দশকে এখানকার ভানুবিলেই গড়ে উঠেছিল ভানুবিল প্রজা আন্দোলন। এই আন্দোলনের মুখে জমিদাররা বাধ্য হয়ে হাতি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের বাড়িঘর। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পঞ্চানন ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ নাথ শর্মা ও লীলাবতী শর্মাসহ অনেক মণিপুরী নারী-পুরুষ। ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই এই কমলগঞ্জে গড়ে উঠেছে অনেক চা বাগান। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ধরে কাজ করে যাচ্ছেন চা বাগানের শ্রমিকেরা। তারপরও তাদের সন্তান-সন্তদের এই চা বাগানগুলোতে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি সরকারি কোনো স্কুল। দৈনিক ২৮ টাকা মজুরিতে এই চা বাগানগুলোতে কাজ করেন প্রায় ছয় লক্ষ শ্রমিক।

কমলগঞ্জের এইসব চা বাগানের একটি হচ্ছে ধলাই চা-বাগান। এর অবস্থান একেবারেই বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের কাছে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা। এর মধ্যে কুর্মিরা এসেছেন ভারতের দুমকা অঞ্চল থেকে। প্রায় ছয় পুরুষ ধরে তারা এই চা বাগানে কাজ করছে বলে তারা জানায়। ১৯৭১ সালে পুরো এক কোম্পানি পাকসেনার ও ভারী অস্ত্রশস্ত্রের ঘাঁটি ছিল ধলাই ক্যাম্প। এই ক্যাম্প দখল করতে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা বার কয়েক ব্যর্থ হন। পরে এই ঘাঁটি আক্রমণ করার জন্য ভারতীয় কমান্ডারের সাথে যুক্ত হন মেজর জিয়া। জেড ফোর্সের চার্লি কোম্পানি, ডেল্টা কোম্পানি, ব্রোভা কোম্পানি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ২৮ অক্টোবর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয় এবং ১ নভেম্বর পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ। এখানে যুদ্ধ করেন ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী, ক্যাপ্টেন হাফিজ, সুবেদার ইব্রাহিম ও ইউসুফ এবং হাবিলদার সুবহান, সাজ্জাদুর রহমান প্রমুখ। বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান এই যুদ্ধে প্রাণ হারান।[১]

পরনের কাপড় শতছিন্ন। দুই কাঁধে ঘায়ের ভয়ানক ক্ষত। মানুষের শরীরে সাধারণত এমন ক্ষত সহজে চোখে পড়ে না। জোয়াল টেনে নিয়ে যায় বলে গ্রামাঞ্চলের অনেক

১. দীপংকর মোহান্ত, 'মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক', সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০ ।

গরু-মহিষের ঘাড়ে এ ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয়। আমরা দেখেই বুঝতে পারি দু' কাঁধে তার জোয়াল টানার দাগ। কিন্তু তাঁর দু'কাঁধে এ ধরনের ক্ষতচিহ্ন আমাদের ভাবিয়ে তোলে এবং আরও বেশি প্রশ্নবিদ্ধ করে যখন আমরা জানতে পারি তিনি একজন শহিদের সন্তান। যাঁর কথা বলছি পরিচিতির দিক থেকে তিনি একজন সাধারণ মানুষ। নাম গণেশ নায়েক। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন তাঁর বাবা দুর্গা নায়েক ও চাচা কৃষ্ণ নায়েক। ১৯৭১ সালে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়েই ওই এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় দুর্গা নায়েক, কৃষ্ণ নায়েক, ঘুরানা ভর এবং লসিমুন কুর্মিকে। তারপর ব্রাশফায়ার করে তাঁদেরকে তারা হত্যা করে। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা ছিলেন আওয়ামী লীগের সরাসরি সমর্থক। সেখানে আরও একজন ছিলেন। বহু কষ্টে তিনি ড্রেনের ভেতর দিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নাম হরিমোহন গোয়ালা।

এই চা বাগানেই মেয়ে রাঙামা কুর্মি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ধলাই চা বাগানে সংঘটিত হয়েছিল বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড। পাকবাহিনীর হাতে বহু নারী হয়েছিলেন ধর্ষণের শিকার, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। তাঁদেরই একজন রাঙামা কুর্মি। জানা যায়, ধলাইয়ের লাগোয়া মৃতিঙ্গা চা বাগানেই ছিল তাঁর বাবার বাড়ি। তবে তাঁর বাবা কিংবা মায়ের নাম জানা যায়নি। তাঁর জন্ম-তারিখও জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা গেছে যে, মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। তাঁর বিষয়ে তথ্য দেন তাঁর ভাসুর এবং ভাসুরের ছেলে।

১৯৬৫ সালের শেষ দিকে এই গ্রামের লসিমুন কুর্মির সঙ্গে বিয়ে হয় রাঙামা কুর্মির। লসিমুন এবং রাঙামা কেউই তেমন লেখাপড়া জানতেন না। কেননা, চা বাগানে সেই একাত্তরে কেন এখনও এ ধরনের কোনো পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। তবে তাঁদের বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন ভারতে থাকতেন বলে এই সীমান্ত পথেই তাঁদের আসা-যাওয়া ছিল বলে জানা গেছে। ১৯৭১-এর জুন মাসে হানাদার বাহিনী হানা দেয় তাঁদের চা বাগানে। সেখানে প্রথমে তাঁর স্বামী লসিমুন কুর্মিকে তারা ধরে নিয়ে যায়। এভাবে তারা আরও তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে। যখন তারা তাঁর স্বামীকে ধরতে আসে, রাঙামা তখন ঘরে শাশুড়ির সঙ্গে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত ছিলেন। বেলা তখন বারোটার মতো। তাঁর শাশুড়ি এবং তিনি নিজে তাঁর স্বামীকে অনেকভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। প্রথমে তাঁর শাশুড়ি এগিয়ে যান পাকসেনাদের কাছে। হাত জোড় করে কাকুতিমিনতি জানান ছেলেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু পাকসেনারা বিন্দুমাত্র কান দেয়নি তার কাকুতিমিনতির প্রতি। শাশুড়ি ব্যর্থ হলে এবার রাঙামা নিজে এগিয়ে আসে। কিন্তু সেও ব্যর্থ হয়। তারা তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যায়। তবে ঘটনার শেষ এখানেই হয়ে যায় না। এবার খানসেনাদের নজর পড়ে লসিমুনের স্ত্রী রাঙামার ওপর। প্রথমে রাঙামা তাঁর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য পাকসেনাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেন। সেই যাত্রায় পাকসেনারা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতে, লসিমুন কুর্মিকে নিয়ে যাবার ঘণ্টা দুই পর তাঁর শাশুড়ি ছেলের বউকে নিয়ে অন্যান্য মহিলার সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। কেননা, তিনি ভেবেছিলেন একবার যখন পাক হায়েনারা পথ চিনেছে, তাহলে আবারও এখানে আসতে পারে। তাই কাল বিলম্ব না করে তিনি রওয়ানা হয়ে যান পার্শ্ববর্তী এলাকার উদ্দেশ্যে, নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর লোকেরা তাঁদের পথিমধ্যে দেখতে পায়। সম্ভবত আগেকার ক্ষোভ থেকেই কিনা, তারা তাঁর শাশুড়িকে রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে রাঙামাকে তুলে নিয়ে যায়। শাশুড়ি অনেক চেষ্টা করেছেন ছেলে-বউকে রক্ষা করতে। পাকসেনাদের পায়ের ওপর বারবার আছড়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু পারেননি তাদের মন গলাতে। পাকসেনারা পাশের কদমতলী বাংকারে নিয়ে যায় রাঙামা কুর্মিকে। সেখানেই তাঁর ওপর চলে বহুজনের অমানুষিক অত্যাচার।

পরপর দুটো ঘটনা অর্থাৎ ছেলে এবং ছেলের বউয়ের এই ঘটনা তাঁর শাশুড়িকে হতবিহ্বল করে তোলে। তিনি হয়ে পড়েন দিশেহারা। শাশুড়ি তাঁদের খুঁজতে থাকেন বিভিন্ন জায়গায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তার এই অনুসন্ধান তৎপরতা। বিভিন্নজনকে জিজ্ঞেস করেন। একজনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওদিকেই তিনি খুঁজতে যান কদমতলীর বিভিন্ন জায়গায়। কেননা পাকিস্তান আর্মি যে রাঙামাকে নিয়ে গেছে, সেটা অনেকেই দেখেছে। তাই পরের দিনও তিনি ওই রাস্তার দিকেই যান রাঙামাকে খুঁজতে। এদিনই দুপুর দুইটার সময় সেই বাংকারের সামনের রাস্তায় রাঙামাকে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁর শাশুড়ি। তখনও রাঙামা কুর্মি ছিলেন জ্ঞানহারা। লোকজনের সাহায্যে তাঁকে তিনি নিয়ে আসেন নিজেদের ঘরে। দুই দিন পর তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর তাঁর শাশুড়ি রাঙামাকে নিয়ে শরণার্থী হয়ে চলে যেতে চান ভারতের মাটিতে। মিলিটারি বাংকারে এক রাত বন্দি থাকার ঘটনা আমূল পরিবর্তন এনে দেয় রাঙামার জীবনে। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতে চাইতেন না। পরিবার-পরিজন তো দূরের কথা, এমনকি তিনি তাঁর চার বছরের মেয়ের দিকেও ফিরে তাকাতেন না। খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজের সম্পর্কে কাউকে কিছু জানাতেন না। এমনকি সেদিন বাংকারে কী ঘটেছিল, সে বিষয়েও তিনি থাকতেন নিশ্চুপ। হয়ে পড়েছিলেন কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন।

কিছুদিন এভাবেই কাটে বউ আর শাশুড়ির। আবারও শুনতে পান আশপাশে পাক বাহিনীর নৃশংস আক্রমণের কথা। শাশুড়ি এবার সিদ্ধান্ত নেন ছেলেবৌসহ ভারতে যাবেন। রাঙামা কুর্মিকে তাঁর শাশুড়ি ভারতে চলে যাবার কথা বলেন, কিন্তু রাঙামা কিছুই বলেননি। এই রকম অবস্থায় তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন ভারতে চলে যাবেন বলে। কিন্তু ততদিনেও স্বাভাবিক হয়নি রাঙামার জীবন। তারপর ছেলে-বউকে নিয়ে ওপারে শরণার্থী হয়ে যাওয়ার পথেই সেদিন বিকেলেই হার্টফেল করে মারা যান রাঙামা।

মৃত্যুকালে তিনি ছোট্ট অবুঝ দুটি মেয়েকে রেখে যান।

শহিদ কাঁকেট

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এবং আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার পর এলাকায় বহু আদিবাসী নারী মুক্তিযুদ্ধে তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে অংশগ্রহণ করেছেন, রেখেছেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাসীনরা যখন ইতিহাস রচনা করেন, তখন বাদ পড়ে এই ধরনের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাভুক্ত প্রতিনিধিদের অবদানের কথা। আর সেই প্রতিনিধিরা যদি হন নারী, তাহলে তো কথাই নেই। ত্রিমুখী প্রান্তিকতাকে (নারী, ধর্ম, জাতি) তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে ইতিহাসে স্থান পাওয়া তাঁদের জন্য অত সহজ হয় না।

বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে যে দুটো সমাজ মাতৃসূত্রিক, তাদের মধ্যে একটি হলো আদিবাসী গারো, অন্যটি হলো খাসিয়া। বৃহত্তর সিলেটের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় খাসিয়ারা বসবাস করে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে এখানকার মণিপুরী ও খাসিয়া সমাজের অনেক নারী-পুরুষ যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, সে-কথা এতদিন অজানাই ছিল। ফলে ইতিহাসে তা যথাযথভাবে স্থান পায়নি।

কোনো কোনো ঘটনাকে মনে হয় একেবারেই অবিশ্বাস্য। সত্যিকারের রূপকথাকেও তা হার মানায়। সেই রূপকথার মতো মুক্তিযুদ্ধসম্পৃক্ত এক ঘটনার নায়িকা খাসিয়া মেয়ে কাঁকেট। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকেই সিলেটের দোয়ারাবাজারের কাছে গড়ে উঠেছিল পাক হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প। ফলে মুক্তিবাহিনী ওই এলাকায় প্রথম দিকে তাদের ঘাঁটি গড়ে তুলতে পারেনি। খাসিয়া মেয়ে কাঁকেটের বাড়ি ছিল মেঘালয় সীমান্তবর্তী সিলেটের দোয়ারাবাজারে। বর্তমানে তাঁদের পরিবারের কেউ সেখানে থাকেন না। চলে গিয়েছেন সীমান্তের ওপারে। কাঁকেটের মৃত্যুই এর প্রধান কারণ কী-না, সেটা জানা যায়নি। তবে ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম ঠাঁই না পেলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। স্থানীয় লোকজন তাঁর জন্মসাল কিংবা জন্মতারিখ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি, এমনকি তাঁর বাবা-মায়ের নামও তাঁরা ভুলে গিয়েছেন। এমনকি কাঁকেটের পুরো নাম কী ছিল, তাও তারা জানে না বলে জানায়। সবাই তাঁকে কাঁকেট নামেই চেনে। তবে বাঙালিদের কাছে সে 'কাঁকুই' নামে পরিচিত ছিল। কাঁকেটকে যারা জানত তাদের বেশিরভাগই বলেছেন, সে খুব উচ্ছল মেয়ে ছিল। তাঁর চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে দু-একজন বলেছেন, "খাসিয়া মেয়ে হিসেবে সে দেখতে ছিল বেশ সুশ্রী। ছিল ছোটখাটো আকৃতির এবং গায়ের রঙ ছিল শ্যামলা। ওই বয়সেই খুব বেশি পান খেত। মুক্তিযুদ্ধের সময় সে ছিল অবিবাহিত। তাঁদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব বেশি ভালো ছিল না। আট-দশটা খেটে-খাওয়া খাসিয়া পরিবারের মতোই ছিল তাঁদের পরিবারের অবস্থা"। তবে দু-একজন বলেছেন, তাঁর একটি ভাই ছিল; কিন্তু সে কী করত, সে-কথা তারা বলতে পারেননি। তাঁর বাবা-মা তাঁর মৃত্যুর পর অনেকদিন পর্যন্ত এদেশে ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কাঁকেটের বয়স কত ছিল? বিশ কি বাইশ। কিন্তু বয়সে নবীনা হলে কী হবে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজটিই করেছেন। খুব বেশি পড়াশোনা তাঁর ছিল না। নিজে কাঁধে বয়ে কাপড় বিক্রি করতেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, তাঁর পিতার ছিল পানের ব্যবসা। তবে কাঁকেট এবং তাঁর মা অন্যান্য খাসিয়া মেয়ের মতো বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাপড় বিক্রি করতেন। তাঁর বাবা-মায়ের অভাবের সংসারে তিনি একটু সচ্ছলতা আনার অভিপ্রায়ে অল্প বয়সেই নিজে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন রোজগারের এই জোয়াল। কাঁকেট তার পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁদের সংসারে কতটুকু সচ্ছলতা আনতে পেরেছিলেন, সেটা জানতে পারা না গেলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে তিনি রেখেছিলেন এক গৌরবময় ভূমিকা। অবশ্য এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাঁকে বরণ করতে হয়েছিল বিয়োগান্তক পরিণতি।

যুদ্ধের প্রথম দিকে আট-দশজন সাধারণ মানুষের মতো চলমান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু জানতেন না কাঁকেট। ফলে এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও তিনি তাঁর ব্যবসা বন্ধ করেননি। খানসেনারা তখন সিলেটে প্রবেশ করছে। সীমান্তের এপার-ওপার দু'পারেই ছিল কাঁকেটের কাপড়ের খরিদ্দার। ব্যবসা করার ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর চোখে পড়ে পাকসেনাদের অত্যাচারের নানা নমুনা। পাকসেনাদের প্রতি তাঁর মনে ঘৃণা তৈরি হতে থাকে। তৈরি হতে থাকে একটা বিদ্রোহী মন। কাপড় বিক্রির ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্নজনের সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন পাকবাহিনীর অত্যাচারের নানা ঘটনা নিয়ে। এক মাস আগেও যাঁর এ বিষয়ে তেমন মনোযোগ ছিল না, হঠাৎ করেই পাল্টে যেতে থাকল। বিভিন্ন কথা জানতে চায় সে মুক্তিবাহিনীর ছেলেদের কাছে। সে তাঁদেরকে সাহায্য করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। প্রথম দিকে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাঁকে বিশ্বাস করতে চায়নি। কেননা, তাঁরা দেখেছে সে রাজাকারদের সাথে ব্যবসা করে। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে তাঁর দেয়া তথ্যের ওপর তাঁরা বিশ্বাস করতে শুরু করে।

একটা পর্যায়ে এসে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাঁকে কাজে লাগাতে চায়। যেহেতু তখন সীমান্তের এপার এবং ওপারেও তখন অবস্থান নিয়েছে মুক্তিবাহিনীর ছেলেমেয়েরা। সীমান্তের দু-পারেই কাঁকেটের অবাধ যাতায়াত থাকায় দু'পারের মুক্তিযোদ্ধাদেরই তিনি খবরাখবর দিতেন এবং তাঁদের চলাচল বিষয়ে সাবধান করে দিতেন। মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাঁকে বলত, "তুমি আমাদের একটু ওপারের খবর এনে দাও। আমরা তো পারছি না। তুমি তাদের গতিবিধির খবর আমাদের এনে দাও, যেমন ওরা কোথায় ছাউনি গেড়েছে, বিশেষ করে রাজাকারদের কাজকর্ম একটু নজর দিয়ে দেখে আমাদের জানাও। তুমি তো খাসিয়া মেয়ে। তোমাকে ওরা সন্দেহ করবে না।"

মুক্তিযোদ্ধাদের এই আবেদন তাঁকে খুবই উদ্দীপ্ত করে। তাঁর ব্যবসার পরিধিও বাড়ায় কাঁকেট। আগে প্রতিদিন বাজারে না আসলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর থেকে তিনি নিয়মিত বাজারে আসতে শুরু করেন বলে তথ্যদাতারা জানিয়েছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাজারে যেতেন, রাজাকারদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন,

পান খেতেন, করতেন খোশগল্প! তারপর তাদের খোঁজখবর নিতেন এবং তাদের সুরে সুর মিশিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সমালোচনা করতেন। তাদের বকাঝকা গুষ্টি উদ্ধার করতেন অনর্গল অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ফলে তাঁর ওপর খুশি হতে থাকে রাজাকার বাহিনী। তাঁকে বিশ্বাস করে তারা অনেক তথ্য দিতে থাকে। জানাতে দ্বিধা করে না তাদের পরবর্তী পরিকল্পনার কথা। আর এভাবেই তাঁর কাজ হাসিল করতে থাকেন এই খাসিয়া নারী। এবং এইভাবে রাজাকারদের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য পাচার করতে থাকেন তিনি মুক্তিবাহিনীর কাছে। বিনিময়ে কিছুই নিতেন না। একাত্তরের আগস্ট মাসের শেষদিকে তাঁর দেয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে দোয়ারাবাজারে একটা ভালো অপারেশন চালায় মুক্তিবাহিনী। তাঁরা রাজাকারদের একটি ঘাঁটি পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যটা এই যে, এই ঘটনা ঘটার অব্যবহিত পরেই জীবন দিতে হয় এই দুঃসাহসী নারীকে।

রাজাকাররা অচিরকালের মধ্যে কাঁকেটকে সন্দেহ করে বসে এবং তারা পাকসেনাদের কাছে তাঁর কথা জানায়। তাঁকে সন্দেহ করার কারণও ছিল। কেননা, তাদের অবস্থান এবং গতিবিধি সম্পর্কে তারা একমাত্র কাঁকেটকেই মনখুলে কিছু বলেছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু কাঁকেট বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কিন্তু রাজাকারদের সন্দেহ দূর হয় না। তিনি ভান করেন যে, তিনি এসবের কিছুই জানতেন না। কিন্তু তারপরও থেমে থাকেনি চতুর এবং শয়তান রাজাকারদের তৎপরতা। তারা ঠিকই বুঝেছিল এটা কাঁকেটেরই কাজ, যতই সে অস্বীকার করুক। যখন তারা দেখল কিছুতেই তাদের কাছে মুখ খুলছে না এই খাসিয়া নারী, তখন তারা মরিয়া হয়ে বিকল্প খুঁজতে থাকে।

তারা খবর দেয় পাকবাহিনীর কাছে তাঁকে শাস্তি দেয়ার জন্যে। ক্ষিপ্ত পাকবাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁর ওপর চালায় অবর্ণনীয় নির্যাতন। চলে তাঁর কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা। কিন্তু শত অত্যাচার-নির্যাতনের পরও তিনি মুখ খোলেননি। বলেননি কোনো মুক্তিযোদ্ধার নাম ও ঠিকানা। তাঁকে পাকিস্তানি ক্যাম্পে আটকে রাখা হয় তিন মাস। দীর্ঘদিন পাকিস্তানি ক্যাম্পে বন্দি রেখে অকথ্য অত্যাচারের কারণে সেখানেই মৃত্যু ঘটে কাঁকেট নামের এই আদিবাসী সাহসী নারীর।

ঘটনার কাল ১৯৭১ সালের ৮ মে। পটুয়াখালীতে ততদিনে আর্মি প্রবেশ করেছে। ঘটনার দিন সকাল আনুমানিক দশটার দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় দক্ষিণ সুতাবাড়িয়া গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার পশ্চিমে চিকনিকান্দী বন্দরে অভিযান শুরু করে। এই বন্দরটি গলাচিপা উপজেলার প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। এখানে অনেক হিন্দু ব্যবসায়ীর বসবাস। চিকনিকান্দীসহ আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম যথেষ্ট হিন্দু অধ্যুষিত। পটুয়াখালী জেলা শহর পতনের পরে এসব গ্রামে পটুয়াখালীসহ দেশের নানা প্রান্ত থেকে বহু হিন্দু পরিবার নিরাপদ আশ্রয় ভেবে ঠাঁই নিয়েছিলেন। পাকসেনারা শুরু করে ব্যাপক গণহত্যাযজ্ঞ। আগুন দেয় বহু বাড়িঘর ও দোকানপাটে। সেই সঙ্গে শুরু করে লুটপাট। উদ্দেশ্য মানুষ হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে জনজীবনে আতংক ছড়িয়ে দেয়া। এটা যে কোনো যুদ্ধেরই একটা বড় কৌশল। দক্ষিণ সুতাবাড়িয়া গ্রামের লোকজন আর্তচিৎকার, গুলির শব্দ শুনে এবং আগুনের শিখা দেখে যে যার মতো বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এই সময় নারীদের অবস্থা স্বভাবতই শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

এই দুঃসময়ে কোথায়, কোন নিরাপদ আশ্রয়ে যাবেন, এ রকম ভাবনা থেকেই গাঁয়ের আরও অনেকের মতো মনোরঞ্জন চক্রবর্তী এবং সুন্দরী বালা চক্রবর্তীর মেয়ে কণকপ্রভা গাঙ্গুলি তাঁর ৪ বছরের মেয়ে অনিমাকে কোলে নিয়ে বাড়ির পূর্ব-উত্তর কোনে এক-দেড় হাজার গজ দূরের খালের তীরবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এই ধরনের অবস্থায় সাধারণত নারীরা একভাবে এবং পুরুষেরা আরেকভাবে যান, কেননা পুরো পরিবারসহ একসাথে পালাতে গেলে সাধারণত ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে মেয়ে এবং ছেলে উভয়েই তাদের সুবিধামতো উপায় বা পথই বেছে নিয়ে থাকেন। শুধু কণকপ্রভা গাঙ্গুলিই নন, একই জঙ্গলে আলাদাভাবে অর্থাৎ তাঁর থেকে ৪০/৫০ গজ দূরে স্বামী নিরঞ্জন গাঙ্গুলিও তাঁদের দুই বছরের ছেলে নিঠুলকে কোলে নিয়ে আশ্রয় নেয়। সেনারা প্রথমে নিরঞ্জন গাঙ্গুলিকে জঙ্গল থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এবং তার পেট বরাবর তারা গুলি চালায়। কিছুটা তফাৎ থেকে এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে কণকপ্রভা মেয়ে অনিমাকে কোলে নিয়েই দৌড়ে স্বামীর কাছে ছুটে এলে সেনারা তাঁকেও লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে অনিমা মারা যান। কেবল রেহাই পায় পুত্র নিখিল এবং নিঠুল। মারা যান কন্যাসন্তান অনিমাও। পরের দিন তিনজনের লাশ উদ্ধার করে বাড়ির পাশেই তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

(তথ্যসূত্র : শহিদের পুত্র নিঠুল, নিখিল ও পুত্রবধূদের সাক্ষাৎকার।)

শহিদ সোনাই রানী সমাদ্দার

যে গ্রামে তিনি শহিদ হয়েছিলেন, তার থেকে বহু দূরের গ্রামের মেয়ে ছিলেন সোনাই রানী সমাদ্দার। তাঁর জন্ম পিরোজপুর জেলার কাঁঠালিয়া উপজেলার বাঁশবুনিয়া গ্রামে। এই গ্রামেরই নিবারণ সেন এবং কিরণবালা সেনের মেয়ে ছিলেন সোনাই রানী সমাদ্দার। তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ২৪ বছর। স্বাধীনতা যুদ্ধের ৭ বছর আগে বিমল সমাদ্দারের সাথে বিয়ের সুবাদে তিনি দক্ষিণ সুতাবাড়িয়া গ্রামে আসেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে তার কোলে ছিল তিন বছরের ছেলে মৃণাল। তিনি এ সময়ে ৮ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। পাকিস্তানি আর্মির একটি গ্রুপ এই সময় একদিন চিকনিকান্দী বন্দরে অভিযান চালানোর অংশ হিসেবে দক্ষিণ সুতাবাড়িয়া গ্রামে অভিযান শুরু করে।

তারা মুহুর্মুহু গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সময় তখন আনুমানিক বেলা এগারোটা। গুলির শব্দ ও মানুষের আর্তচিৎকার শুনে তখন যে যার মতো পালাচ্ছে। সোনাই রানী প্রথমে একটু অপেক্ষা করেন কার সাথে পালাবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে শেষে কাউকে না পেয়ে তিনি একাই পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য তিনি জানতেন বেশিদূর তিনি যেতে পারবেন না। কেননা, তাঁর পেটে ছিল সন্তান অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তাই তিনি বেশিদূর না গিয়ে নিজেদের বাড়ি থেকে পুবমুখো দিকের জঙ্গল বরাবর দৌড়াতে শুরু করেন। কিন্তু পেটে সন্তান থাকায় তিনি বেশি দূর যেতে পারেননি। বাড়ির পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতেই সেনারা তাকে পেছন থেকে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরের দিন তার লাশ মাটি চাপা দেয়া হয়।

(তথ্যসূত্র : শহিদের স্বামী বিমল সমাদ্দারের সাক্ষাৎকার।)

শহিদ পারুল বালা সমাদ্দার

দক্ষিণ সুতাবাড়িয়া গ্রামে যেদিন আর্মি আসে, সেদিন তারা পথে যাকেই পেয়েছে তাকেই হত্যা করেছে। এমনকি বাড়িতে বাড়িতে গিয়েও তারা হত্যা করেছে নির্বিচারে। পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলের মা পারুল বালা বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সেদিন রাজাকারসহ পাকিস্তানি সেনাদের আসতে দেখে স্বামীর হাত ধরে বাড়ির দক্ষিণ পাশের ধান ক্ষেত লক্ষ্য করে দৌড় দেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর বাড়িতে তখন চলে এসেছে একে একে অনেক সৈন্য। বাঁচতে চেষ্টা করেছেন তিনি এবং তাঁর স্বামী। ভেবেছিলেন পুকুরের মধ্যে কিছুক্ষণ ডুবে থাকবেন। কিন্তু তা আর করতে পারেননি। বাড়ির সামনের ডান পাশের ডোবার কাছাকাছি যেতেই পেছন থেকে সেনারা তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে তাঁরা শহিদ হন।

একদিন পর তাদের লাশ উদ্ধার করে মাটিচাপা দেয়া হয়।

(তথ্যসূত্র : শহিদের নাতি খোকন সমাদ্দারের সাক্ষাৎকার।)

শহিদ বাসন্তী রানী বসু

এটিও একই দিনের ঘটনা। সেই ভয়াল ৮ মে, ১৯৭১। গলাচিপাবাসীর কাছে একটি দুঃসহ দিন। দক্ষিণ সুতাবাড়িয়া গ্রামের মেয়ে বাসন্তী রানী বসু। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ মূহূর্তে বাসন্তী রানীর বিয়ের কথা চলতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের কারণে তার বিয়ে পিছিয়ে যায়। তারা ৩ বোন, ৩ ভাই। বোনদের মধ্যে তিনি বড়। ঘটনার দিন সকালে হালকা বৃষ্টি ছিল। পাকবাহিনীর মুহুর্মুহু গুলিবৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাবেন ভেবে কূল না পেয়ে বাসন্তী ধান ক্ষেতের দিকে দৌড়াতে শুরু করেন। বাড়ির পূর্ব-উত্তর কোনের পুকুরের পূর্ব পাড়ে পৌঁছাতেই সেনারা তাকে অপর পাড় থেকে গুলি করে। গুলি খেয়ে বাসন্তী পড়ে যান পুকুরে। খানসেনাদের ভয়ে একটু আগে পুকুরে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাসন্তীরই বড় ভাই সন্তোষ। পাকসেনারা যেখানটায় দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার কাছাকাছি সেখানে পুকুরের পানিতে ডুব দিয়ে থাকা সন্তোষ হঠাৎ করে দেখতে পান গুলি খেয়ে কেউ যেন পুকুরের পানিতে পড়ে গেছে। কিন্তু সে যে তার বোন বাসন্তী সেটা তিনি বুঝতে পারেননি। যে-ই পড়ে থাকুক, সেই সময় তাঁকে পুকুর থেকে উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না, কেননা তাঁর নিজেই তখন মৃত্যুর মুখোমুখি। পরের দিন পুকুর থেকে বাসন্তীর লাশ তোলা হয়। পুকুরের পাড়ে বাঁশঝাড়ের পাশে তাঁকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল।

(তথ্যসূত্র : ভাই সন্তোষ বসুর সাক্ষাৎকার।)

বিদ্যাসুন্দরী দাস

পাশের বাড়িতে পাকিস্তানি সেনাদের গুলির শব্দ ও মানুষের আর্তচিৎকার শুনে বিদ্যাসুন্দরী দাস নিজের ঘর থেকে দৌড়ে বের হন, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর নিজের ঘরের উঠোনেই খানসেনাদের বুটের আওয়াজ। বের হওয়া মাত্রই উঠোনের মধ্যেই বর্বর পাকসেনাদের রাইফেল থেকে ছোঁড়া গুলিতে শহিদ হন। বিদ্যাসুন্দরী ছিলেন বিধবা।
(তথ্যসূত্র : নাতি নির্মল দাসের সাক্ষাৎকার।)

সাবিত্রী রানী দত্ত

ছয় ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জননী সাবিত্রী রানী দত্ত পাকিস্তানি সেনাদের তাড়া খেয়ে কোলের ৬ মাসের ছেলে অরুণ দত্তকে নিয়ে বাড়ির উত্তর পাশের খালের পাড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হঠাৎ করে তাঁর কোলের শিশুটি কেঁদে ওঠে। শিশুর কান্না থামাতে সাবিত্রী রানী তার মুখে নিজের স্তনের বোঁটা গুঁজে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও শিশুটির কান্না থামছিল না। কান্নার শব্দ শুনেই সেনারা তাকে জঙ্গল থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এবং মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই তিনি শহিদ হলেও অলৌকিকভাবে শিশু অরুণ দত্ত বেঁচে যায়।
(তথ্যসূত্র : শহিদের বড় ছেলে চান মোহন দত্তের স্ত্রী সাধনা রানী দত্তের সাক্ষাৎকার।)

শহিদ সুমিত্রা রানী দত্ত

বিশ্বনাথ দত্ত এবং আরতি দত্তের চার ছেলে-মেয়ের মধ্যে সবার বড় সুমিত্রার একাত্তর সালে বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। সে বেশিদূরে গিয়ে লুকোতে পারেনি। তার বাবা-মায়ের সাথে বাড়ির দক্ষিণ পাশের জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছিল। তবে সে তাদের চেয়ে কিছুটা দূরেই ছিল। পাকসেনারা তার পরনের লাল জামা দেখে তাকে খুঁজে বের করে এবং পেটে গুলি করে হত্যা করে। এ দৃশ্যটি তারা বাবা-মা দু'জনই দেখেছিলেন।
(তথ্যসূত্র : মা আরতি রানীর সাক্ষাৎকার।)

শহিদ শান্তি দেবী

জন্ম ১৯৩০
মৃত্যু ১২ জুন, ১৯৭১
পিতা : ধনরাজ ধানুকা
জন্মস্থান : গোহাটি, আসাম
স্বামী : যমুনা প্রাসাদ সিংহানিয়া
পরিবারে অবস্থান : দুই ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড়

ভারতের রাজস্থান থেকে আসা মাড়োয়ারিরা বাংলাদেশে প্রায় একশো বছর আগে থেকেই বসবাস করছে। মূলত বাণিজ্যিক কারণেই তাদের এদেশে আসা। এই মাড়োয়ারিদের বেশিরভাগেরই বসবাস উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বিশেষ করে সৈয়দপুর ও দিনাজপুর এলাকায়। ১৯৭১ সালের ১২ জুন পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায় তাতে সৈয়দপুরে প্রায় চারশো জন মাড়োয়ারি মারা যান।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, ১৯৭১ সালে সৈয়দপুরে প্রায় ১,০০০ মাড়োয়ারির বসবাস ছিল। এপ্রিলে যখন পাক হানাদার বাহিনী সৈয়দপুরে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। গৃহবন্দি হয়ে পড়েন সবাই। সে সময়ও সৈয়দপুরে বিমানবন্দর ছিল। সেই বিমানবন্দরে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ ও গজিয়ে ওঠা আগাছার জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য বেশ কিছু মাড়োয়ারিকে সেখানে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়। বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকজন বাঙালির হাত-পা পর্যন্ত কেটে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় সেনাবাহিনীর ঘাতকেরা।

১২ জুন ভোর পাঁচটায় এই মর্মে একটা খবর দেয়া হয় যে, সমস্ত মাড়োয়ারিকে ভারতে তাঁদের নিজ নিজ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসা হবে। ভোর পাঁচটার দিকে ট্রেন ছাড়বে। এই খবর পেয়ে প্রায় পাঁচশো মাড়োয়ারি কথিত সেই ট্রেনে উঠে পড়ে প্রাণে বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে। ট্রেনের চারটি বগিতে এই মানুষগুলো বাঁচার স্বপ্ন নিয়ে ঠেলাঠেলি করে উঠে পড়ে। ছেলেদের এক বগিতে রাখা হয় আর মেয়েদেরকে রাখা হয় অন্য বগিতে। কথিত ভারতগামী ট্রেনটি গোলাহাটে পৌঁছার পর পরই প্রথম বগিতে শুরু হয় হট্টগোল। বিহারি পুলিশ এবং পাকিস্তান আর্মিরা শুরু করে তাদের তাণ্ডবলীলা। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। তারা বাচ্চাদের রেললাইনে ছুঁড়ে ফেলে মারে। তারা দা, বঁটি, ছুরি এবং পরে গুলি করে হত্যা করে প্রায় চারশো মানুষকে। মাত্র তেইশ জন মানুষ সেই হত্যাযজ্ঞ থেকে নিজেদের রক্ষা করে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলেন।

মৃত্যুর হাতে পরাভব মানাদের একজন হলেন শান্তি দেবী। পিতা ধনরাজ ধানুকার এক ছেলে এক মেয়ের মধ্যে শান্তি ছিলেন সবার বড়। পিতা ছিলেন আসামের গোহাটিতে ছাতার ব্যবসায়ী। ব্রিটিশ আমলেই তাঁরা এখানে চলে এসেছিলেন অন্যান্য মাড়োয়ারি পরিবারের সঙ্গে। বিয়ে হয় তাঁর যমুনা প্রসাদ সিংহানিয়ার সঙ্গে। তাঁদের ছিল বারো সন্তান। এর মধ্যে বড় ছেলে তখন ব্যারিস্টারি পড়তেন। ঘটনার আগেভাগে তিনি ঢাকা থেকে সৈয়দপুরে আসেন এবং সেদিনের ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে শান্তি দেবীও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ছেলে-মেয়েরাও সেই ঘটনায় মারা যান। তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি। তবে অনেক পরে সেই এলাকা থেকে প্রায় ১৮ বস্তা কংকাল উদ্ধার করা হয়। ধারণা করা হয়, তার মধ্যেই ছিল হতভাগ্য শান্তি দেবীর লাশ।

শহিদ কিরণ রানী সাহা

পিতা : রঘুনাথ সাহা
মা : নাম জানা যায়নি
স্বামী : রাধাকৃষ্ণ সাহা
জন্মস্থান : আইভারা মধ্যপাড়া, ভাঙ্গা, ফরিদপুর
জন্ম : ১৯০৬
মৃত্যুর তারিখ : মধ্য জুলাই, ১৯৭১
ঘাতক : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী

কিরণ রানী সাহার জন্ম ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার আইভারা মধ্যপাড়া নামের সাদামাটা এক গ্রামে, ১৯০৬ সালে। পিতা রঘুনাথ সাহার তিন ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে সবার বড় কিরণ রানী। পড়াশোনা তিনি করতে পারেননি। তাঁর বিয়ে হয় দিনাজপুরের কোতোয়ালি থানার বড় বন্দরের ব্যবসায়ী রাধাকৃষ্ণ সাহার সঙ্গে। খুব অল্প বয়সেই তিনি আসেন স্বামীর ঘর করতে। ক্রমে পাঁচ ছেলে ও সাত মেয়ের মা হন। একাত্তর সালের আগেই স্বামীকে হারান কিরণ রানী সাহা। বিশাল এই পরিবারে ১৯৭১ সালে নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা।

মার্চের শেষ মধ্যভাগে দিনাজপুরে যখন বিহারি-বাঙালি রক্তাক্ত সংঘাত শুরু হয়, তখন তাঁর তিন ছেলে একসাথে ভারতে চলে যায়। সে সময় কিরণ বালা ভারতে যেতে চাননি। তিনি বলেছিলেন, “এখানে আগে অবস্থা দেখি। অবস্থা খারাপ দেখলে চলে যাব।”

একাত্তরের জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে তাঁর ছেলে অমরনাথ সাহা এবং হেরম্বনাথ সাহা ভারত থেকে আসেন তাঁকে নিয়ে যেতে।

সেদিন ছিল জুলাইয়ের এগারো কিংবা বারো তারিখ। সকাল সাতটার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিন থেকে চার জন সদস্য তাদের ঘরে ঢোকে। তারা কাউকেই বিস্তারিত কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কেবল জিজ্ঞেস করেছিল, তাঁরা হিন্দু না মুসলমান। সে সময় কিরণ রানী সাহা বিছানায় বসে ছিলেন। নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে ধরে নিয়ে যায় তারা। বাড়িতে তারা তাঁদের গুলি করেনি। তবে ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র লুটপাট করে।

কিরণ রানী সাহার সঙ্গে তখন থাকত একটি মেয়ে, যে তার দৈনন্দিন কাজে তাঁকে সবসময় সাহায্য করত। সেই মেয়েটি যেই দেখল সেনাবাহিনী ঘরে ঢুকেছে তখন সে অন্য কায়দা করে একটি রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

কিরণ রানী সাহাকে তার দুই ছেলে অমরনাথ ও হেরম্বনাথ সাহা নিয়ে যাওয়া হয় চোখ বেঁধে। দিনাজপুরের কালীবাড়ি সংলগ্ন পুকুরে তাঁদের মেশিনগান দিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনাটি পরে সুমঙ্গল কুণ্ডর কাছ থেকে শুনতে পান বাড়ির লোকজন।

সেদিনে কী ঘটেছিল তা বলতে না পারলেও পরের দিন বাড়ি ফিরে এসে যা দেখেছিল, তাঁর বর্ণনা কিরণ রানীর বেঁচেবর্তে থাকা অন্য সদস্যদের কাছে দেশ স্বাধীনের পর দিয়েছিলেন সেই কাজের মেয়েটি। বর্তমানে তিনি বেঁচে নেই। থাকলে তার কাছ থেকে হয়তো আরও অনেক তথ্য পাওয়া যেত।

শহিদ ভাগীরথী সাহা

জন্ম : ১৯৪০
মা : চারুবালা সাহা
বাবা : বসন্ত কুমার সাহা
জন্মস্থান : দেবীপুর, কচুয়া উপজেলা, বাগেরহাট
শহিদ হবার দিন : ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
অবস্থান : তিন বোনের মধ্যে দ্বিতীয়
ঠিকানা : বাঘমারা, পিরোজপুর থানা, পিরোজপুর
পেশা : গৃহিণী
মৃত্যুর সময় বয়স : ৩১ বছর
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তান সেনাবাহিনী, সহযোগিতায় দেশীয় রাজাকার

'ভগীরথ' থেকে উৎসারিত হয়েছে ভাগিরথী। রামায়ণ অনুসারে ইক্ষাকুবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র ভগীরথ মাংসপিণ্ডরূপে জন্মগ্রহণ করলেও পরে অষ্টাবক্র মুনির ইচ্ছাক্রমে তিনি রূপবান হন। লিপ্ত হন কঠোর তপস্যায়। তপস্যায় সফল হলে গঙ্গা নদীকে প্রথমে শিবের জটা ধারণে সাহায্য করেন। পরে শিবের জটাকে মর্তের ভূমিতে আনেন। গঙ্গার স্রোতধারার স্পর্শে সাগরের পুত্রগণ পুনরায় প্রাণ লাভ করে স্বর্গে গমন করেন। ভগীরথীর নামানুসারে গঙ্গানদীর মূলধারাকে এক সময় ভাগীরথী বলা হতো। বর্তমানে এর একটি শাখাকে ভাগীরথী বলে।

কিংবদন্তির ভাগীরথীর নদীর নামে যাঁর নাম, তাঁর রক্তস্রোত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তগঙ্গার ধারায় মিশে আর একটি শাখা নদীর রক্ত স্রোত হবে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

শহিদ ভাগীরথী সাহা। একটি নাম, একটি সংগ্রাম। পিরোজপুর জেলার অহঙ্কার তিনি। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অনন্য উজ্জ্বল নাম। ভাগীরথীর জীবন-দীপ নিভে গিয়েছিল ১৯৭১ সালে।

তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল এক বর্বর নৃশংস পন্থায়। মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর দেহ দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে তা প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল পুরো পিরোজপুর শহর। সে ইতিহাসের এক লোমহর্ষক অধ্যায়।

পিতা বসন্তকুমার সাহা এবং মা চারুবালা সাহার তিন মেয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান ভাগীরথী জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪০ সালে। এক সময়কার অবস্থাপন্ন বসন্ত সাহা বিপদে

পড়ে সহায়-সম্পদ হারিয়ে মুড়ি বিক্রির পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যৌতুক এবং বিয়ের কোনো খরচ না দেয়ার শর্তে তিনি তাঁর দ্বিতীয় মেয়ে ভাগীরথীকে বিয়ে দিয়েছিলেন পিরোজপুরের বাঘমারা গ্রামের ৪৫ বছরের প্রিয়নাথ সাহার সঙ্গে। দুই সন্তান কার্তিক এবং গণেশের জন্ম হবার কিছুকাল পরেই বিধবা হন ভাগীরথী।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় প্রতিরোধ চলছে, এমন একটা খবর বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পিরোজপুরের এম.এন.এ. অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন খানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তি সশস্ত্র সংগ্রামের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেন। ২৭ তারিখের পরপরই মেজর আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে শুরু করা হয় মুক্তিফৌজের জোর সামরিক প্রশিক্ষণ।

পিরোজপুরে যেদিন পাকিস্তানি আর্মি আসে, সেদিন তারা এসেছে আশেপাশের গ্রামের মানুষদের পাখির মতো গুলি করতে করতে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভাগীরথী প্রায়ই গ্রাম থেকে পিরোজপুর শহরে আসতেন ভিখারিনীর বেশে। আবার পিরোজপুর শহরে সময় কাটিয়ে ফিরে আসতেন গ্রামে। সাথে থাকত কখনও তাঁর ছেলে কার্তিক, কখনওবা গণেশ। মাঝে-মধ্যে তাঁকে একাও দেখা যেত।

এটা ছিল আসলে ভাগীরথীর ছদ্মবেশ। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল পাকসেনাদের খবরাখবর জেনে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জানানো। ভিখারিনীর ছদ্মবেশধারী ভাগীরথী পাকসেনাদের করুণা কামনা করে তাদের সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হন। ফলে তিনি তাঁর ভিক্ষার পাত্র পূর্ণ করে অর্থাৎ পর্যাপ্ত গম-চাল নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন। ভাগীরথীকে এক পর্যায়ে তারা তাদের সুবেদার সেলিমের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেয়।

অন্যদিকে ভাগীরথী গ্রামে ফিরে আবার পাকসেনাদের সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়ে দিতেন। মুক্তিযোদ্ধারা ভাগীরথীকে আরও সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরা করার এবং নিরাপত্তামূলক অবস্থানে বসবাস করার পরামর্শ দিতেন। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে ভাগীরথী সুকৌশলে পূর্ব পরিকল্পনামতো মুক্তিযোদ্ধাদের অবাঞ্ছিত তৎপরতা এবং গোপনে গ্রামবাসীদের সংগঠিত হওয়া সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে পাকসেনাদের তাদের এবং তাদের নিকটবর্তী গ্রামে দু-দু'বার নিয়ে আসে এবং আগে থেকেই জঙ্গলে গেরিলা পদ্ধতিতে লুকিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা রাইফেলের গুলি ছুঁড়লে পাকসেনারাও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। ১৯৭১ সালের ২৯ আগস্ট পাকসেনারা বাঘমারায় আসে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে গ্রামের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় পাকসেনারা ব্যূহ রচনা করলেও রণকৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। যার ফলে বিক্ষিপ্ত গুলিতে পাকবাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়।

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভাগীরথী পিরোজপুর এসে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা সম্পর্কে পূর্ব পরিকল্পনামতো পাকসেনাদের অবহিত করে। পাকসেনারা তাদের প্রয়োজনমতো যাবতীয় তথ্য জেনে নেয় এবং ভাগীরথীকে পরের দিন আসার জন্য বলে। ভাগীরথী

গ্রামে ফিরে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি জানালে মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে বিচলিত হয় এবং অসম সংঘর্ষের আশঙ্কা করে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বরে সংঘটিত মুক্তিযোদ্ধাদের আকস্মিক হামলায় নাজেহাল এবং গুলিবিদ্ধ হওয়ায় পাকসেনারা ভাগীরতীর প্রদত্ত তথ্য মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে করে এবং তারা এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, ভাগীরথী মুক্তিযোদ্ধাদের চর। ভাগীরথী ভিখারিনী বেশে পাকসেনাদের শিবিরে এসে তাদের তথ্য-উপাত্ত, রণ-কৌশল পরিকল্পনা এবং কর্মকাণ্ড জেনে নিয়ে তাদের শত্রুপক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করে। তাদের ধারণা জন্মে, ভাগীরথী মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের গ্রামাঞ্চলে নিয়ে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তাদের নিশ্চিহ্ন করার গোপন কৌশলে লিপ্ত আছে।

ফলে পাকসেনা এবং তাদের দোসর রাজাকারদের ওপর নির্দেশ দেয়া হয়, ভাগীরথীকে শহরে যেখানে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে, তাঁকে ক্যাপ্টেন এজাজের কাছে ধরে নিয়ে আসতে হবে। নির্দেশমতো পাকসেনাদের একটা বিশেষ দল এবং রাজাকার বাহিনী ভাগীরথীকে ধরার জন্য তাদের টহল জোরদার করে।

এরপর আসে সেই ভয়াবহ দিন– একাত্তর সালের ১৩ সেপ্টেম্বর। এদিন হিন্দু পাড়ায় রাজাকার এসে কয়েকটি ঘরে লুটপাট করে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় সাহাপাড়ার অনেকগুলো ঘর। ভাগীরথীর ঘর ভেঙে নেয়ার জন্য তাঁরা অনেকবার এসেছে। কিন্তু তাঁর অমায়িক কথাবার্তা শুনে তারা তাদের পরিকল্পনা বাতিল করে চলে গেছে। ভাগীরথী মুক্তিযোদ্ধাদের বৈঠকে স্থানীয়ভাবে হতে যাওয়া, অথবা অদূর ভবিষ্যতে হবে, এমন সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা বা পরিকল্পনার কথা শোনে। পাশাপাশি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে আনা ট্রানজিস্টার-রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর শুনে ভাগীরথীর মনে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু ভয়ও ছিল। হিন্দু পাড়ায় বসবাস বলে যুক্তি-পরামর্শ করে একদিন একখানা সাইন বোর্ডে 'মুসলিম বাড়ি' কথাটি লিখিয়ে এনেছিলেন। তারপর মুক্তিযুদ্ধের এক ঘোর দুর্দিনে সেটিকে নারকেল গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

সেদিন সকালে ছেলে কার্তিকের হাত ধরে তিনি পিরোজপুরের পথে রওয়ানা দেন। দীর্ঘ পথের শেষে স্রোতের বেগে তরতর করে তাদের নৌকাটি ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে দামোদর খালের মধ্যে এসে ঢোকে। অন্যান্য দিন পিরোজপুর আসতে দুই-তিন ঘণ্টা লেগে যেত। আজ সকাল দশটার মধ্যেই গোডাউন ঘাটে এসে ভিড়ল তাদের নৌকা। পাড় থেকে রাস্তায় উঠতে গিয়ে ভাগীরথী চারদিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করার জন্য এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে নিলেন। হঠাৎ দেখলেন সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের দিক থেকে পাকসেনারা ৭-৮ জন যুবককে বেঁধে পাহারা দিয়ে বলেশ্বর বধ্যভূমির দিকে নিয়ে চলেছে। ভাগীরথী পাকসেনাদের দৃষ্টিতে না পড়ার জন্য দ্রুত মাথার কাপড় মুখের ওপর টেনে নিজেকে আড়াল করে ফেলেন। পাকসেনারা পথ অতিক্রম না করা পর্যন্ত ভাগীরথী নিথর, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠে পূর্বদিকের রাস্তা ধরে কার্তিককে নিয়ে বাজারের উদ্দেশে হাঁটতে থাকেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মনোহরপট্টিতে এলে তারিণী সাহার দোকানের সামনে একটা ভিড়

দেখতে পান এবং ছেলে কার্তিককে তেলের শিশি ও ব্যাগ হাতে তুলে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেন। এদিকে মনোহরপট্টিতে অপেক্ষমাণ একজন পাকসেনা এবং দুই জন রাজাকার ভাগীরথীর সামনে এসে দাঁড়ায়। ধারণা করা হয় যে, সম্ভবত আগে থেকেই তাঁরা ভাগীরথীর অবস্থান জেনে নিয়েছিল। তারা দেখামাত্রই ভাগীরথীকে জানায়, ক্যাপ্টেন এজাজ এবং সুবেদার সেলিম তাকে নিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। ভাগীরথী নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকলে পাকসেনা এবং রাজাকাররা তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। ভাগীরথীকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবার সময় এক দিগ্বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে রাজাকাররা। তারা তাঁকে নিয়ে আসে সুবেদার সেলিমের কাছে। ভাগীরথীকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "ভাগীরথী তুম মুক্তিফৌজকী গোয়েন্দা হ্যায়?" ভাগীরথী নিরুত্তর থাকে। তিনি আরও নানা প্রশ্ন করেন ভাগীরথীকে। পাক ক্যাপ্টেন জানতে চান ভাগীরথীই মুক্তিযোদ্ধদের তাদের পরিকল্পনা ইত্যাদির কথা জানিয়েছে কি-না? কিন্তু কিছুতেই মুখ খোলেননি ভাগীরথী। তখন ক্যাপ্টন সেলিম বলেন, ভাগীরথীকে এই সাজা দেয়া হলো যে, তাঁকে সবার সামনে হত্যা করা হবে।

ভাগীরথী পাথরের মতো স্থবির হয়ে যান। একজন সেপাই তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়, পথ চলতে সাহায্য করে। তারা তাঁকে পাক হানাদারদের ক্যাম্প অফিসের সামনে নিয়ে আসে। ভাগীরথীকে সেখানে দাঁড় করিয়ে সুবেদার সেলিম ক্যাম্প অফিসে প্রবেশ করে একটি মোটরসাইকেল নামিয়ে ডাকবাংলোর সামনে রাখে। সুবেদার প্রহরারাত একজন সেপাইকে একটি দড়ি আনতে বলে। সেপাই দড়ি নিয়ে সুবেদারের কাছে এলে সুবেদার ভাগীরথীর দু'হাত বাঁধার এবং বুকে-পিঠে দড়ি পেঁচিয়ে তা মোটরসাইকেলের সঙ্গে বেঁধে দেয়ার নির্দেশ দেয় সেপাইকে। একজন মহিলাকে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে মোটরসাইকেলের সঙ্গে বেঁধে দেয়ার এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে অনেকেই সেখানে থমকে দাঁড়ান।

ধীরে ধীরে মোটরসাইকেলে স্টার্ট দেয়া হয়। মুহূর্তের মধ্যে সবাই দেখতে পায় মোটরসাইকেলের সঙ্গে এক মহিলাকে বেঁধে সদর রাস্তার দিকে টেনে নিয়ে আসছে একজন মিলিটারি। সুবেদার সেলিম ভাগীরথীকে টেনেহিঁচড়ে শহর প্রদক্ষিণ করার পর বলেশ্বর নদীর দিকে নিয়ে যায়। বলেশ্বরের তীরে বধ্যভূমিতে ভাগীরথীকে টেনে নেয়ার সময় তার পরিধেয় কাপড় ছিঁড়ে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। সুবেদার সেলিম ভাগিরথীকে নদীতে নিক্ষেপ করতে যাবার মুহূর্তে তারা দেখতে পায় তার দেহে তখনো প্রাণের স্পন্দন আছে, অর্থাৎ এত নির্যাতনের পরও ভাগীরথী বেঁচে আছে। সুবেদার সেলিম এই অবস্থায় ভাগীরথীকে তার সঙ্গে আনা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করে। গুলিতে ভাগীরথীর জীবন স্পন্দন থেমে গেলে তাকে নগ্ন অবস্থায় নদীতে ফেলে দেয়া হয়। চোখের পলকে তাঁর মৃতদেহ হারিয়ে যায় বলেশ্বরের ঢেউয়ে।

এভাবেই শেষ হয়ে যায় বাংলার এক জোয়ান অব আর্কের জীবন।

শহিদ লুৎফুন্নাহার হেলেন

জন্ম : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৭
শহিদ হওয়ার তারিখ : ৫ অক্টোবর, ১৯৭১
জন্মস্থান : মাগুরা
মা : মোছাম্মাৎ ছফুরা খাতুন
বাবা : মোঃ ফজলুল হক
স্বামী : আলী কদর
সন্তান : লুৎফে আলী দিলীর
ঠিকানা : হরেকৃষ্ণপুর, মোহাম্মদপুর, মাগুরা
অবস্থান: পাঁচ ভাই এবং আট বোনের মধ্যে সপ্তম
পারিবারিক নাম : হেলেনা
পেশা মাগুরা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, বাম আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক।
ঘাতকের পরিচয় রাজাকার বাহিনীর হাতে প্রথমে ধরা পড়েন। তাদের মাধ্যমে পাকিস্তানি ক্যাম্পে তাঁকে সমর্পণ। পরে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে মৃত্যু।
তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর পরিবার বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁকে হত্যা করার পর ফেলে দেয়া হয় নবগঙ্গা নদীর ডাইভারশন ক্যানেলে।

১৯৬৭ সালে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সম্প্রচার বন্ধ হয়ে গেলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরুপ লুৎফুন্নাহার হেলেন তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন—

"২৪শে আষাঢ়, ১৩৭৪ সাল।

"সরকারের এক বিশেষ নির্দেশে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ হয়ে গেছে। বাঙালির ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্য আবার সরকারী মহল তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের এই ধরনের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাপঞ্জীকে। ...আজ এরা রবীন্দ্র সঙ্গীত বাদ দিচ্ছে, কাল এরা বলবে রবীন্দ্র সঙ্গীতই মুসলিম ঐতিহ্যের অনুকূলে নয়। এদের এই বহুল ব্যবহৃত 'মুসলিম ঐতিহ্যের' (?) দোহাই দিয়ে এরা আরো কত কী যে করবে তা 'খোদাই মালুম' না বলে বলতে হয় মুজিবই মালুম। ...হঠাৎ স্বাধীনতা লাভের ২০ বছর পর মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি। ...রবীন্দ্রনাথ তো শুধু পশ্চিম বাংলার কবি নন। তিনি বাঙালির কবি। ...তিনি বিশ্বকবি।"

একই ডায়েরিতে অন্য এক তারিখে তিনি লিখেছেন :

"৫ই আশ্বিন, শুক্রবার ১৩৭৪ সাল—রাত্রিকাল

"...পুরানো প্রতিজ্ঞাটিকে নতুন করে ঝালাই করছি। সর্বহারার মুক্তি আন্দোলনের এই পটভূমিকায় সক্রিয় অংশ নিতেই হবে। প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ বিপ্লব করতে হবে। ...স্বার্থ-সর্বস্ব জীবনের প্রাচুর্য বিলাসিতায় আত্মসুখ নেই। আমি সুস্থ মস্তিষ্কে অনেক ভেবেছি—আত্মকেন্দ্রিক প্রাচুর্যময় জীবনকে গ্রহণ করার মতো কোনো দুর্বলতাকেই আমি আমার মনের আনাচেকানাচে হাতড়েও পাইনে।"

খুব কম মানুষের জীবনেই মেধা, মনন এবং বিশাল হৃদয়ের সমন্বয় ঘটে থাকে। লুৎফুন্নাহার হেলেন ছিলেন সেই দুর্লভ মানুষদের একজন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন একটু ব্যতিক্রমধর্মী। ছিলেন বইয়ের পোকা। সবসময় নিজেকে পড়াশোনার মধ্যেই ডুবিয়ে রাখতেন। বাবা-কাকাদের মিলিত অর্থাৎ যৌথ পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। প্রত্যেকের দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্মের বহরও কম ছিল না। কিন্তু পরিবারের অভিভাবক স্থানীয়রা হেলেনের বিষয়ে ছাড় দিতেন। তাই হেলেনকে ছোটবেলায় সাংসারিক কাজ করতে হতো না বললেই চলে। বরং বলা চলে, তাকে কাজ করতে দেয়া হতো না। অসম্ভব মেধাবী ছিলেন বলেই তাঁর বাবা-মাসহ পরিবারের অন্যরা তাঁকে সাংসারিক কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতেন। তাঁর বাবা মোঃ ফজলুল হক ছিলেন মাগুরার পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি আজীবন ন্যাপ এবং কৃষক সমিতির সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকেই তিনি নিজের পরিবারের প্রত্যেক ছেলেমেয়ের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে ছিলেন সবিশেষ উদ্যোগী ও যত্নবান। আর সে কারণেই ছোটবেলা থেকে প্রতি ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া মেয়ে হেলেনের প্রতি তাঁর টান বুঝি একটু বেশিই ছিল। তিনি তাঁকে যশোরে নিয়ে গিয়েছিলেন ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়াতে। পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিলেন হেলেন। মনে রাখা দরকার, হেলেন যখন বৃত্তি পাচ্ছে, তখন তার শিক্ষা জীবন এগিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকের দিকে। তখনকার বাংলাদেশে বাঙালি সাধারণ মুসলমান ঘরের মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের হার তেমন চোখে পড়ার মতো ছিল না। নারী শিক্ষার এই অবস্থা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা অর্জনের মধ্য দিয়ে একজন খ্যাতনামা নারী হবার প্রবল ইচ্ছা ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর মনে। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রতিভা বিকাশে ছিল তাঁর অদম্য আগ্রহ। অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল তাঁর প্রিয় বইগুলো। নিজে পড়াশোনা করেই আলোকিত হবেন না, অন্যকেও শিক্ষার আলোকে আলোকিত করতে হবে— এই ব্রত নিয়েই তিনি গ্রামের অনেক ছেলে-মেয়েকেও অক্ষরজ্ঞান দিতে শুরু করলেন। এর পেছনে কাজ করেছে তাঁদের নিজেদের পারিবারিক বিদ্যাশিক্ষার ঐতিহ্য। হেলেনের রক্তে তখন চার প্রজন্মের পারিবারিক শিক্ষার আলোকধারা।

বস্তুত রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম নেয়া ও বেড়ে ওঠা হেলেন তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো ছড়াতে গিয়ে পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারী পথকেই অবলম্বন ধরেন। সর্বহারা

মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজেকে যুক্ত করেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে। মফস্বলে সেই সময় একজন নারীর পক্ষে মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করা তেমন সহজসাধ্য কিছু ছিল না। ছিল নানা ধরনের বাধা। কিন্তু হেলেন ছিলেন এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কারণ তাঁর পেছনে ছিল তাঁর পরিবারের সমর্থন এবং তাঁর নিজের প্রজ্ঞা ও সাহস। ফলে আমরা স্কুল-জীবন থেকেই হেলেনকে ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলন এবং স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিতে দেখি। দেখি ফেস্টুন হাতে মিছিলের প্রথম সারিতে থেকে স্লোগান মুখর হবার অভ্যাস অর্জন করতে। তাঁর ছোটো ভাই-বোনদের লেখাপড়ার হাতেখড়ি তাঁর কাছেই। তাঁর ছোট বোন মাহমুদা খাতুন রিনা জানান, "আমাদের ছোট ভাই-বোনদের সবাইকে হেলেন আপাই পড়াতেন। মাঝে-মধ্যে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগানোর জন্যে হেলেন আপা আমাদের নিয়ে যেতেন। আমরা রঙ বানাতাম। জানতাম না কীসের জন্য, কিন্তু আমরা হেলেন আপাকে ভালোবাসতাম বলে তিনি যা বলতেন, তা-ই শুনতাম। এর মধ্যে হেলেন আপা যখন ঢাকায় পড়তে চলে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে একটু দূরত্ব তৈরি হলো। কিছুদিন পর ফিরে এলে আবারও তৈরি হলো সেই সখ্য। অন্যকে শেখানোর তাঁর যে আগ্রহ, সেটা শুধু নিজের ছোটো ভাই-বোনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রামের অনেক ছোট ছেলে-মেয়ের অক্ষরজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল হেলেনের কাছেই।

১৯৬৩ সালে সাফল্যের সঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করার পর ভর্তি হন ঢাকায় ইডেন কলেজে। ঢাকা শহরে এসেও হেলেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে। তখন তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারা বিবরণী পাঠ করতেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে ছিল মাগুরার ছাত্র আন্দোলনে, সর্বহারা বিপ্লবে। মাস আটকের পরেই চলে আসেন আবার মাগুরায়। আবার ভর্তি হন মাগুরা সরকারি কলেজে। এই কলেজেই নিজের যোগ্যতায় হেলেন ছাত্র সংসদের মহিলা শাখার সম্পাদিকা নির্বাচিত হন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, মাগুরা মহকুমা শাখার সহ-সভানেত্রীর পদে আসীন থেকে স্থানীয়ভাবে চলমান ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পারিবারিকভাবে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন তিনি হননি। কেননা তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডল ছিল একজন নারীর বিকশিত হবার পক্ষে। সে সময় দেশে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবল জোয়ার। তার বিরুদ্ধে তাঁর মধ্যে মনে গড়ে উঠেছিল প্রতিবাদের বিশাল পাহাড়। ১৯৬৮ সালে বিএ পাস করার পর হেলেন মাগুরা গার্লস হাইস্কুলে (বর্তমানে সরকারি গার্লস হাইস্কুল) সহকারী শিক্ষিকার পদে যোগদান করেন।

একটু মুডি ছিলেন তিনি। কখনও আগে থেকে তাঁর সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যেত না এবং বোঝা যেত না তিনি কখন কী করবেন। এত কম বয়সে এতটা ব্যক্তিত্ব খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি একটু জেদি ছিলেন। সামান্য কিছুতেই তিনি ফিট হয়ে পড়তেন। অনেক পড়াশোনা করে অনেক বিখ্যাত হবেন—এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। গ্রামের আশেপাশের অনেকের জন্যই খুবই নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন হেলেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকেই আগস্ট মাস পর্যন্ত হেলেন কখনও মাগুরা শহরে তাঁর পিতার বাড়িতে থাকতেন, কখনও থাকতেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। এ সময় মাগুরার রাজাকার-আলবদরদের নেতৃত্বে ছিল জামায়াতে ইসলামী দলের ঘাতক খুনিচক্র। এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে তাঁর বোন জানান, "১৮ অগাস্ট বাড়ি রেইড হলো, আমরা সবাই বাড়ি ছেড়ে গেলাম। প্রথমে আমজাদ শরীফ নামে একজন স্থানীয় নেতার বাসায় লুকিয়ে থাকলাম, তার বড় মেয়ে ছিল হেলেন আপার বান্ধবী। তারপর সেখান থেকে গেলাম মেজবোনের শ্বশুরবাড়ি আকসীতে। আমরা অক্টোবরের ১ তারিখ ঢাকায় চলে আসলাম। হেলেন আপা আসলেন না, থেকে গেলেন সেখানে।"

১৯৭১-এর মাঝামাঝি পাকবাহিনী তাদের এদেশীয় সহযোগীসহ মোঃ ফজলুল হক সাহেবের বাড়ি ঘেরাও করে হেলেনের বড় ভাই মাহফুজুল হক ও তাঁর অন্য ভাইদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে। ভাগ্যবশত তার অন্যান্য ভাইয়েরা অন্য লোকের সাহায্যে দ্রুত আত্মগোপন করার মাধ্যমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন। এই রকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় হেলেন মাগুরা শহরে কাটিয়েছেন তাঁর দুই বছরের শিশুপুত্র দিলীরকে নিয়ে। এই সময় তাঁর কাজ ছিল মাগুরা শহরে রাজাকার ও পাকবাহিনীর ভূমিকা ও তাদের তৎপরতা সংক্রান্ত কর্মসূচির সংবাদ জেনে তা অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠানো। হেলেনের ভাইদের ধরতে না পেরে টহল দিতে এসে একদিন কয়েকজন রাজাকার তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে ধরে নিয়ে যায় চোখ বাঁধা অবস্থায়। পরে তাঁরা তাকে ছেড়ে দেয় বেশ কিছু টাকার মুক্তিপণের বিনিময়ে। হেলেনের ছোট ভাই জাহাঙ্গীর কবির দাদুকেও একদিন রাজাকাররা দিনের বেলায় ধরে নিয়ে যায় এবং চরমভাবে তাঁকে শারীরিক নির্যাতন করে। তারপর পিছন দিয়ে তাঁর দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে মাগুরা ডাকবাংলোর চার দেয়ালের মধ্যে ফেলে রাখে।

জুলাই মাসের শেষদিকেই হেলেন মাগুরা শহর ছেড়ে মহম্মদপুর চলে আসেন মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য। তাঁর একমাত্র সন্তান দিলীরও তখন তাঁর সঙ্গে ছিল। মাগুরা ছেড়ে আসার সময় হেলেনের বাবা তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে তাঁর কাছে রেখে যাওয়ার জন্য। কিন্তু হেলেন তাতে রাজি হননি। মহম্মদপুর এলাকায় আসার পর চলমান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে হেলেনের দায়িত্ব ছিল—মেয়েদের, বিশেষত ভূমিহীন গরিব কৃষক পরিবারের মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা; রাজনৈতিক বইপত্র রাখার ব্যবস্থা করা এবং মুক্তিবাহিনীর কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া এবং দেখাশোনার ব্যবস্থা করা।

তাঁর স্বামী মুক্তিযোদ্ধা আলী কদরের বয়ান থেকে জানা যায়, সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে হেলেন ছিল মহম্মদপুরের দক্ষিণাঞ্চলে। হেলেনের মৃত্যুর ঘটনা ছিল করুণ এবং মর্মান্তিক। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে আমাদের মহম্মদপুর এলাকার বাহিনী পুলুম এলাকায় মহম্মদপুর থানার এক গ্রামে অবস্থানকালে রাজাকার ও ঘাতক দালালদের গুপ্তচরের সহায়তায় হেলেন ২ বছর ৫ মাস বয়স্ক শিশুপুত্র দিলীরসহ রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ে গেলে তাকে তারা সরাসরি নিয়ে আসে মাগুরা শহরে।

এরপর পাকবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। এই খবর জানতে পেরে হেলেনের বাবা এবং তাঁর কিছু আত্মীয়স্বজন ছোট্ট বাচ্চা শিশু ও মা হেলেনের মুক্তির জন্য পাকবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে যারপরনাই অনুরোধ করেন। জানা যায় তাঁর মুক্তির বিষয়ে সবচাইতে বেশি বাধা সৃষ্টি করেছিল জামায়াতপন্থি কিছু মানুষ।

হেলেনের মৃত্যু হয় ১৯৭১ সালের ৫ অক্টোবর রাত্রিবেলায়। ঐ রাতেই তারা হেলেনের শিশুপুত্র দিলীরকে তাঁর বাড়ির এক লোকের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয় নানাবাড়িতে। হেলেনকে একদিন রাখা হয় রাজাকার মাওলানা মাহবুবের বাড়িতে। তারপর তথ্য আদায়ের জন্য তাঁর ওপর চালানো হয় অবর্ণনীয় শারীরিক-মানসিক অত্যাচার এবং এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। তারপর তাঁর লাশ জিপের পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাস্তার ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় মাগুরা শহরের অদূরের নবগঙ্গার ডাইভারশন ক্যানেলে। লুৎফুন্নাহার হেলেনকে হত্যা করার জন্য যারা পাকবাহিনীকে উৎসাহিত করেছিল, তাদেরই একজন বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক। নাম তার রেজাউল করিম। কোনো একটি সরকারের আমলে তিনি এই অপরাধের জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুব বেশি সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করা সম্ভব হয়নি। ফলে তিনিও সেই অপরাধ থেকে আইনিভাবে মুক্তি পেয়ে আবার তার চাকরি ফিরে পেয়েছেন। জানি না এই লজ্জা কার!

শহিদ সেলিনা পারভীন

জন্ম : ৩১ মার্চ, ১৯৩১
শহিদ হওয়ার তারিখ   ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১
জন্মস্থান : ছোট কল্যাণ নগর, ফেনী
মা : মোসাম্মৎ সাজেদা খাতুন
বাবা   মৌলভী আব্দুর রহমান
অবস্থান : নয় ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয়
পারিবারিক নাম : মনি
পেশা : সম্পাদক, 'শিলালিপি'
মৃত্যুর সময় বয়স : ৪০ বছর
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, সহযোগিতায় দেশীয় রাজাকার।

'আবেদন'
জীবনটাকে গেল না ভদ্র করা–
কিছুতেই–
গেল না, পরিস্থিতিটাও
হাতের মুঠোয় জড় করা। জতুইন বিবি
কত কাঁদলেন।
তসবিহ পানিতে ভিজে গেল, তবু–
তবু চঞ্চল খেয়ালী বালকের মতো, উপদেশগুলো
চলে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে
স্মৃতিহীনতার দেশে।
এমত অবস্থায়
পাড়ার মিন্তির ছেলেকে নিয়ে,
টি-বি স্যানেটোরিয়াম, না করে দৌড়াদৌড়ি
কিইবা করতে পারি?
কারণ, কিছুই তো করতে পারি না।
আমার চাই লোক সঙ্গ। অথচ,
চায় না কেউ স্বাস্থ্যহীন লোক সঙ্গ।
কিন্তু বড় ভালোবাসি মানুষকে আমাকে রেখে যেও না চোরাবালিতে

–হে মানুষ আমি তো মূর্খ।
এখনও প্রত্যকটি কথার দাম দেই
এ মানুষের, আর
আমার মূল্যহীন উচ্ছ্বাসের
ক্ষমা করো আমায় তোমরা
মূল্যবান কথাগুলো বড়ই পিচ্ছিল
এখনও প্রতারকের হাসিতে আমি শিশুকে দেখি।
('শিলালিপি', ২য় সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ফেব্রুয়ারি, '৭০)

বাংলাদেশের যে কয়জন সোনার সন্তানকে ডিসেম্বরের ১৩ এবং ১৪ তারিখে বাসা থেকে উঠিয়ে রায়ের বাজারসহ বিভিন্ন বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়, তৎকালীন 'শিলালিপি' পত্রিকার সম্পাদক সেলিনা পারভীন তাদের অন্যতম। বাংলার এই সূর্যকন্যা জন্মগ্রহণ করেন বৃহত্তর নোয়াখালীর ফেনী জেলায়। বাবা মৌলভী আব্দুর রহিম ছিলেন ফেনীর প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের হেডমাস্টার। সে সময় এর নাম ছিল গুরু স্কুল। শিক্ষক মৌলভী আব্দুর রহিম এবং গৃহকর্ত্রী মোসাম্মৎ সাজেদা খাতুনের নয় ছেলে-মেয়ের মধ্যে মনি দ্বিতীয়।
ফেনী সরলা বালিকা বিদ্যালয়েই শুরু হয় তাঁর স্কুল জীবন। ছোটবেলা থেকেই মনি ছিলেন স্বভাব এবং চলনে একটু ব্যতিক্রমী। তাঁর বড় বোন ফয়জুন্নেসা বেগম সেই ছোট্ট মনির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান, "ছোটবেলায় ও খুব চঞ্চল ছিল। নিজেকে ও ছেলেদের সমকক্ষ মনে করত। কখনও ও মেয়েদের কোনো খেলা খেলত না। বরং ছেলেদের সঙ্গে মনি হা-ডু-ডু খেলত, পিঠাপিঠি ভাইদের সঙ্গে বিবাদ করত। এমনকি করত মারামারিও। সেজন্য বাবা-মার কাছ থেকে প্রচণ্ড ধমক খেতে হতো। মারও জুটত তাঁর কপালে। একবার যদি কান্না শুরু করত, তাহলে সেই কান্না চলত কয়েক ঘণ্টা ধরে। কেউ তাকে থামাতে পারত না। যেদিন তাঁকে প্রথমে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলেন আমাদের ছোট কাকা, সেদিনকার কথা এখনও মনে আছে। বাসায় এসে সে কী রাগ আর ঝাঁপাঝাঁপি, কেন পিঠাপিঠি ভাইয়ের মতো করে তাকে স্কুলে পাঠানো হলো না, সেজন্য। ভাইকে ইংলিশ প্যান্ট, জুতা, মোজা পরানো হয়েছে এবং তার ফ্লাস্কে দুধও দেয়া হয়েছে, তাকে তা দেয়া হয়নি কেন? ঈদে বাবাকে অস্থির করে ফেলত দামি জামা-কাপড় দেয়ার জন্য। আমার জীবন ছিল একবারেই সাদামাটা। আমি এসব কখনোই খেয়াল করিনি। আমি বই, লুডু, স্কিপিং নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।" ফয়জুন্নেসা বলে চলেন, "আরেকটা দিনের কথা মনে পড়ে। তখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি। স্কুল থেকে বাসায় ঢুকেই দেখি উঠোনে চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে মনি চিৎকার করে বলছে, "ওরে কচি পাতা, তোদের বলি, আমার শক্তি নাই, আমি কী করব তোদের জন্য, আর কিচ্ছু অবশ্য মনে নেই। সে কিন্তু আরও কী সব বলছিল, আমাকে

দেখেই তখন থেমে যায়। সবার ওপর সর্দারি করারও একটা প্রবণতা ছিল মনির। তার কথামতো চলতে হতো আমাকে। মনে হতো সেই বুঝি বড় আর আমি ছোট। কিছুটা বড় হয়েই মনি প্রায়ই আমাকে বলত, 'তুমি বড় বোকা।' প্রায়ই স্কুলে যেতে চাইত না। এভাবেই চলছিল দিন। আমিও তাকে খুব বেশি রকম ভালোবাসতাম। কারণ, তখনকার দিনে আমার সঙ্গী-সাথী ছিল একমাত্র সে-ই। কেননা, তখনকার দিনে বাড়ির বাইরে বের হওয়া ছিল বারণ। বেড়াতে বা ঘুরতে যাওয়াও ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আদর, সোহাগ, মান-অভিমান—সবকিছু ও আমার কাছেই প্রকাশ করত। প্রচণ্ড রাগ করলেও কেবল আমিই তাঁকে শান্ত করতে পারতাম। ফেনীতে আমাদের বাড়িতে ছিল ইয়া বড় পুকুর। এই পুকুরে সাঁতার কাটার সময় প্রায়ই আমাকে তাঁর হাতে চুবুনি খেতে হতো, বড় বোন হওয়া সত্ত্বেও। দুরন্ত ছিল সে। গাছে ওঠা ছিল তাঁর কাছে নস্যি। মাঝে মাঝে আমরা চার ভাই-বোন মিলে পারিবারিকভাবে নাটক মঞ্চস্থ করতাম। মনি খুব সুন্দর গান গাইতে পারত। কোনো গান ভালো লাগলে একবার শুনেই তা হুবহু সুরে গাইতে পারত।"

সেলিনা পারভীনের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ছোট বোন জেবুন্নেসা জানান, "আমরা তাঁর ছোট ভাই-বোনরা তাঁকে ডাকতাম ছোট্ট বু বলে। ছোট্ট বুর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মা সবসময় বিরক্ত এবং বিব্রত হতেন। কিন্তু বাবা ছিলেন এর একবারেই বিপরীত। তিনি তাঁর এই দুরন্ত একরোখো কন্যাটিকে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। তাঁর প্রতি ছিল তার একটু বেশিই পক্ষপাতিত্ব। ঐ বয়সেই ছোট্ট বু কবিতা লিখতে শুরু করেন। বেশ ভালো চা বানাতে পারতেন। ট্রেতে সুন্দর করে চা-নাস্তা সাজিয়ে বাবার সামনে এনে দিয়ে নিজের লেখা কবিতা তাকে পড়ে শোনাতেন। আর এভাবেই বাবাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিতেন ছোট্ট বু।

"কিন্তু আমার সাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত বাবা, যিনি সে যুগে স্বদেশী করে কলেজ ছেড়েছেন, মাকে হাতে চরকায় কাটা কাপড় পরিয়েছেন, নজরুলের 'অগ্নিবীণা' কবিতার বইসহ সাপ্তাহিক পত্রিকা ভিপিতে গাঁয়ের বাড়িতে পাঠিয়েছেন, আমার সেই প্রগতিবাদী বাবা হয়ে উঠলেন অবিশ্বাস্য রকমের দুর্বল-ধর্মভীরু। জীবনের চরম সিদ্ধান্তটি নিলেন তিনি এই সময়। ছোট্ট বু'র হঠাৎ বিয়ে দিয়ে দিলেন তিনি ১৯৪৩ সালে, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে। বিয়ে হলো ঠিকই; কিন্তু স্বামীর ঘর তাঁকে দিয়ে আর করানো গেল না। রামগঞ্জে রায়ট হলো, দেশ ভাগ হলো, ফেনী চলে এলাম আমরা; কিন্তু হতভাগী ছোট্ট বু'র জন্য তখন মৌলবাদী অধ্যুষিত শহরে জীবনের সবগুলো দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি ঘরের চৌহদ্দিতেই লেখাপড়ায় ডুবে রইলেন। পাড়ার পাঠাগার থেকে ছোট ভাইরা নিয়মিত তাঁকে বই এনে দিত এবং টাকা পেলে তিনি নিজেও বই কিনতেন। আর কবিতা লিখতেন খাতার পর খাতা ভর্তি করে। পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। কিছুতেই তাঁকে আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করানো গেল না।

"অত্যন্ত জেদি ছিলেন ছোট্ট বু। আমাদের বাসা ছিল গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের পাশেই। বাড়ির সামনের গেট পর্যন্ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল ফুল ও ফলের বাগান।

একদিন বুবু দুটি লম্বা বেণী করে সেই বাগানে হাঁটছিলেন। মা রাগ করে বললেন, 'ঘোমটা না দিয়ে বেণী ঝুলিয়ে হাঁটছিস, রাস্তা থেকে সবাই দেখছে, মরলে বেণী দুটো তোকে সাপ হয়ে কামড়াবে'—বুবু দ্রুত ঘরে এসে কাপড় কাটার বড় কাঁচিটি দিয়ে একেবারে গোড়া থেকে বেণী দুটো ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কেটে ফেললেন। মাকে বললেন, 'বেণী দুটো কেটে ফেললাম, এখন আর সাপ হয়ে কামড়াতে পারবে না।'

"আমাদের ছোট্ট বু ছিলেন জন্মশিল্পী। ভালোবাসতেন সাজতে ও সাজাতে। তাঁর প্রিয় ঋতু ছিল বর্ষা। প্রিয় ফুল ছিল বেলী। বেলী কুঁড়ির মালা গেঁথে কাঁসার থালায় সন্ধ্যা বেলা সাজিয়ে রাখতেন বারান্দার টেবিলে। ক্লাস সেভেনে ওঠার আগেই 'পথের পাঁচালী'র কাহিনী আমার জানা হয়ে গিয়েছিল আর নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় 'অক্রূর সংবাদ'-এর অর্ধেকটা হয়ে গিয়েছিল মুখস্থ। মা ও ছোট ভাই-বোনদের ঘরোয়া আসরে বুবু বই থেকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। আমি যে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, সে বছর সবার অনুরোধে বুবুও পরীক্ষা দেন। বহুদিন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার ওপর পাঠ্যবই অপেক্ষা পাঠ্যসূচির বাইরের বইয়ের প্রতিই এই সময় হয়ে পড়েছিলেন বেশি অনুরক্ত। অঙ্ক করে সময় নষ্ট করার চাইতে চাঁদের আলো উপভোগ করা, নয়তো কবিতা রচনার ব্যাপারটিকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাই কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সনদপত্রই তাঁর জীবনে জুটল না। ১৯৪১ সালে ছাত্রজীবন বিঘ্নিত হয় এবং গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন।

"ফেনীতে ছাত্র পড়িয়ে তাঁর কর্ম-জীবন শুরু হয়। ১৯৫৬ সালে প্রথম ঢাকায় আসেন। ১৯৫৭ সালে তিনি মিডফোর্ড হাসপাতালে (বর্তমানে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ) নার্সিং ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে মেট্রনের চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি খুব বেশিদিন কোথাও চাকরি করতে পারেননি। আজীবন প্রতিবাদী চরিত্রের কারণে তিনি আপস করেননি কোথাও। না সংসারে, না কর্ম-জীবনে। যখনই তাঁর সঙ্গে বনিবনা হতো না কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই তিনি অবলীলায় তা ছেড়ে দিতে পারতেন। ১৯৬০-৬১ সালে তিনি আজিমপুর বেবিহোমে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৫ সালে সলিমুল্লাহ এতিমখানায় চাকরি নেন। ১৯৬৬ সালে সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকায় সম্পাদিকার সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর সত্যিকারের সাহিত্যচর্চা। এ সময় থেকেই তিনি নিবন্ধ ও সংবাদ-ভাষ্য রচনায় দক্ষতা অর্জন করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানেই কর্মরত ছিলেন।

সাহিত্য রচনায় তাঁর হাতেখড়ি হয় ১৪ বছর বয়স থেকেই। ১৯৪৫ সালে তখনকার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মোহনগঞ্জে থাকাকালীন কলকাতা নিবাসী শিক্ষয়িত্রী উমাদির সংস্পর্শে আসেন। উমাদি তাঁকে সাহিত্য চর্চা বিষয়ে উৎসাহিত করেন। 'পূর্বদেশ', 'আজাদ', 'দৈনিক পাকিস্তান', 'সংবাদ', 'বেগম' এবং 'ইত্তেফাক'-এ তাঁর রচিত কবিতা, নিবন্ধ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও তাঁর কোনো লেখাই সংরক্ষণ করা হয়নি।

১৯৬২ সালে তিনি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া নিবাসী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর চৌধুরীকে বিয়ে করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি মা হন এবং ১৯৬৬ সালে দ্বিতীয় বারের মতো বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান।

সে যুগে যে বয়সে স্বামী-সংসার নিয়ে থিতু হতে পারলেই একজন নারী নিজেকে সার্থক মনে করত, সেই সময় তিনি সব কিছু ছেড়ে প্রচলিত সব ধরনের প্রথার শৃঙ্খল ভেঙে অসুস্থ নবজাতককে বুকে তুলে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার স্থির সংকল্প করেন এবং পরিবার আর রক্ষণশীল সমাজের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে একা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এক অজ্ঞাত অনিশ্চিত জীবনযুদ্ধে। এই সময় তিনি বহু ধরনের পেশা অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছেন; কিন্তু কোথাও স্থির হতে পারেননি। সেসব পেশায় তাঁর মন বসেনি।

শহিদ সেলিনা পারভীনের জীবনে ছিল বিপ্লবী দুটো দিক। প্রথমত পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ত সমাজের প্রবল পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। ফলে পশ্চাৎপদতার অন্ধকারে ওই সমাজের অনেক ধ্যান-ধারণাকে তিনি ভাঙতে না পারলেও কিছু পরিমাণে হলেও তাকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। মেনে নিতে পারার মতো কোনো আবরণ দিয়ে তিনি নিজের জীবনকে আড়াল করতে চাননি। যখন যেটিকে অসহ্য মনে হয়েছে সেটিকে পাশ কাটাতে কিংবা আপাত তার থেকে সরে আসতে কোনো দ্বিধা ছিল না তাঁর। এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব।

এরই মধ্যে দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল ৬৮/৬৯-এর দুর্বার গণআন্দোলন। তিনি শরিক হলেন এই গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনগত কর্মকাণ্ডে। বেরিয়ে পড়তেন নানা কাজে। সোৎসাহে যোগ দিতেন বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রতিবাদে আর সভায়। পাশাপাশি সচেষ্ট হলেন তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অবশেষে ভাই ও বন্ধুদের জামিনে ব্যাঙ্ক থেকে কিছু কিছু টাকা ঋণ করে বের করলেন তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্রুব লক্ষ্য সাহিত্য পত্রিকা 'শিলালিপি'। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৬৯-এর এর গণ-আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনে। কিন্তু সাময়িকীটি নিয়মিত প্রকাশ করা সম্ভব হলো না, অনিয়মিত নানা সমস্যাজনিত কারণে।

ঘটনাযোগে এসে গেল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এর আগে তিনি একাই ছিলেন প্রতিবাদী। সেজন্য এ সমাজের নিয়মনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর অপ্রকাশ্য সেই আন্দোলনের মর্মটা ছিল এ রকমের, একজন পুরুষ যদি পায় ইচ্ছেমত জীবন গড়ার স্বাধীনতা, তাহলে একজন নারী কেন বঞ্চিত হবে তেমন স্বাধীনতা থেকে এবং কেন পারবে না তাঁর জীবন প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে? তাদের বেলায় কেন ধর্মের নামে আরোপ করা হবে নানা ধরনের বিধি-নিষেধ। যে জীবন যন্ত্রণায় তিনি বিদ্ধ হয়েছেন এতদিন, সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তিলগ্নের বুঝি আসন্ন। তিনি উতলা হয়ে ওঠেন মুক্তির গানে। বেরিয়ে পড়েন নানা জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আজকের বহু প্রতিষ্ঠিত লেখক ও কবির লেখা এনে ছাপিয়েছিলেন সেলিনা পারভীন একাত্তরের সেই উত্তাল সময়ে। তাঁর পত্রিকা প্রকাশনায় নিশ্চয়তা ছিল না, তারপরও তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণআন্দোলন

এবং স্বাধীনতার পক্ষে রচিত কবিতা সংগ্রহ্ করে নিয়ে প্রকাশনার প্রচেষ্টা চালান এবং আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে তাঁর সম্পাদিত 'শিলালিপি' পত্রিকা শেষ সংখ্যা বের করতে সমর্থ হন।

কিন্তু প্রকাশিত পত্রিকা এবং পত্রিকার প্রচ্ছদ পছন্দ হয়নি পাকিস্তান সরকারের। রাও ফরমান আলী সেলিনা পারভীনকে পতাকার প্রচ্ছদ পাল্টাতে বলেন। কেননা, 'শিলালিপি' পত্রিকার শেষ প্রচ্ছদ এমনভাবে আঁকা হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে আভাসিত হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই সময়ে প্রকাশনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে সামরিক মন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে সশরীরে তলব করা হয়। এতে তিনি কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন দফতর ঘুরে খোঁজখবর নিতে থাকেন। খোঁজখবর করার পর তিনি জানতে পারেন যে, ফেনীর একসময়কার মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনের নেতা পরবর্তীকালে 'পূর্বদেশ' পত্রিকায় কর্মরত এবং জামায়াতের এক উগ্র অঙ্গ সংগঠনের হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সক্রিয় নায়ক চৌধুরী মাইনুদ্দিন অজ্ঞাত কারণে সেলিনা পারভীনের ওপর প্রবল আক্রোশে ক্ষুব্ধ। সম্ভবত 'ললনা'য় চাকরিকালীন সেলিনা পারভীনের লেখা গল্প, কবিতা বা পরে 'শিলালিপি'তে স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর রচনার বিষয়বস্তু ঘাতক মাইনুদ্দিনকে ক্ষিপ্ত করে থাকতে পারে এবং তার পরিণামে তাঁর ভয়ঙ্কর মৃত্যুর ঘটনা।

সেলিনা পারভীনের সন্তান চৌধুরী সুমন জাহিদ তাঁর মায়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, "আমি ছোট হলেও আম্মা আমাকে সব জায়গায় নিয়ে যেতেন। মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের ৭ মার্চ জনসভাতে আমাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ভোরবেলায় খালি পায়ে পাঞ্জাবি পরে প্রভাতফেরিতে যেতাম। অথচ আম্মা আমাকে অন্য সময় খালি পায়ে দেখলেই চিৎকার শুরু করে দিতেন। দেখতে দেখতে চলে আসলো মুক্তিযুদ্ধ। আমরা ঘরে বন্দি হলাম। আম্মা, আমি এবং উজির মামা রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র এবং বিবিসির অনুষ্ঠান শুনতাম। আম্মা শুনতেন আর আমাকে ধমক দিতেন। বলতেন আস্তে আস্তে বাজাতে। চরমপত্র শুনে আম্মা খুব মজা পেতেন।

"অফিস করা প্রায় তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। জমানো টাকাও শেষ হওয়ার দিকে, পত্রিকা বের করতে হলে সামরিক বিভাগের অনুমতি নিতে হতো। আম্মা অবশেষে তাই করলেন এবং রাও ফরমান আলীর কাছে গেলেন।

"সর্বনাশের চূড়ান্ত হলো তখনই। তিনি ঐ ঘৃণিত ব্যক্তির নজরে পড়ে যান এবং তাঁকে নানা ছুতায় দিনের পর দিন ঘোরাতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা আম্মাকে আদেশ করল শিল্পী হাশেম খানের আঁকা শিলালিপির প্রচ্ছদ পরিবর্তন করতে। এদিকে শিলালিপির আগেরকার সংখ্যাগুলোর লেখক ও কবিদের পরিচিতি পেয়ে তারা ভয়ানক ক্ষুব্ধ। হয়তো ঐ সময়ই রাও ফরমান আলী বুঝে গিয়েছিল এই মহিলাকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। তাছাড়া এ সময় আমাদের বাসায় প্রায়ই দিনই কিছু ছেলে আসত এবং খেয়ে যেত। পরে জেনেছি ওরা মুক্তিযোদ্ধা।"

১৯৭১ সালে সেলিনা পারভীন থাকতেন সিদ্ধেশ্বরীর একটি বাসায় তাঁর ৭ বছরের ছেলে সুমন এবং ভাই উজিরকে নিয়ে। তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর ভাই উজির বলেন, "বুবু সুমনকে প্রতিদিন নিজে গোসল করাতেন এবং নিজে তাকে খাইয়ে দিতেন। সুমনকে তিনি স্কুলে ভর্তি করাননি, যদি তাকে স্কুলের টিচাররা বকা দেয়, এই ভয়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুবু সুমনকে তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে যেতেন। পত্রিকায় রিপোর্ট করার জন্য জন্য বুবু তখন ঢাকার সব ছবি দেখতেন সুমনকে সাথে নিয়েই। বুবুই সুমনকে বিভিন্ন ছড়া শেখাতেন। সুমন আগ্রহভরে তা শিখত এবং আবৃত্তি করত। "

"আতঙ্কের ভিতর দিয়ে দিন পার হচ্ছিল। তার মধ্যেই এলো আমার জীবনে স্বজন হারানোর সবচেয়ে দুঃখের মাস। ১৩ তারিখ সকাল দশটার দিকে আমরা ছাদে উঠেছি, বুবু তখন সেখানে বসে ঢাকনায় রঙ লাগিয়ে ছবি আঁকছিলেন। এর আগে সুমনের গায়ে বুবু তেল মেখে দিয়েছিলেন স্নান করাবেন বলে। এগারোটার দিকে আমাদের বাসার সামনে রাস্তার ওপারে সুরকার ও সিনেমা পরিচালক খান আতার বাসার সামনে একটা মাইক্রোবাস ও লরি এসে থামে। দুটি পরিবহন যান থেকে নামা লোকজনদের দেখে মনে হলো তারা কাকে যেন খুঁজছে। কিছুক্ষণ পর তারা চলে গেল।

"বাইরে রাস্তায় তখন ঘনঘন মিলিটারি জিপ আসা-যাওয়া করছিল। প্লেন থেকে আত্মসমর্পণের লিফলেট ছাড়া হচ্ছিল ঢাকায়। আমি আর সুমন প্রতিদিন ছাদে উঠে তা দেখতাম। বুবুকে বলেছিলাম, "বুবু আপনি এখান থেকে সরে দাঁড়ান।" আমাদের ছাদটা ছিল একেবারে খোলা, রাস্তা থেকে দেখা যেত। বুবু সুমনকে নিয়ে নিচে নেমে গেলেন এবং গোসল সেরে সুমন আবার ছাদে এলো। তখন ছিল শীতকাল। বুবু রান্না করছিলেন। এরপর দুপুর আনুমানিক একটার দিকে আবার গাড়ির শব্দ, খুব কাছ থেকে। একটু পর আমাদের প্রধান গেইটে প্রবল ঝাঁকুনি। আমি ও সুমন ছাদ থেকে তখন উঁকি দিয়ে দেখলাম। একটা গাড়ি আমাদের বাসার সামনে এসে থামল। কয়েকজন লোক বাসায় ঢুকতে চাচ্ছে। তাদের সবারই গায়ে এক রঙের পোশাক। মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা। আমি নামলাম, সুমনকে চুপ থাকতে বললাম। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের পাহারাদার দরজা খুলে দিল এবং আগন্তুকেরা বুবুর নাম বলল। তারা তখন ওই লোকটিকে তাঁর বাসায় ঢুকতে বলল এবং আমাদের দরজায় নক করল। বুবু দরজা খোলার পর তারা বুবুকে তাদের সাথে যেতে বলল। তার আগে বুবুর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হলো এবং বাসায় কারা থাকে সেটা জানল। আমি তখন ছাদ এবং নিচের তলার সিঁড়ির মাঝখানে। আমি উঁকি দিতেই তারা আমার দিকে বন্দুক তাক করল। সুমন ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। বুবু পরিচয় দিলেন আমাদের। তারপর বললেন, 'বাইরে তো কারফিউ, এখনও খাওয়া-দাওয়াও করিনি।' তাঁরা বলল, 'আমাদের সাথে কারফিউ পাস এবং গাড়ি রয়েছে। আপনাকে কিছুক্ষণ পরেই আবার দিয়ে যাব। বুবু শাড়িটা বদল করতে চাইলে তারা বলল, তাদের হাতে সময় নেই। এই অবস্থায় সুমন সিঁড়ি থেকে নেমে বুবুর কাছে যায় এবং বলে, 'আম্মা আমিও যাব।' তারা বাধা দেয়।

অগত্যা বুবু সেই অবস্থাতেই তাদের সাথে যেতে বাধ্য হন। যাবার সময় বুবুর শেষ কথা ছিল, 'সুমন, তুমি উজির মামাকে নিয়ে খেয়ে নিও। আমি কাজ সেরেই চলে আসছি।' আমার সাথে কথা বলার সুযোগ তিনি পেলেন না। আমাকে বললেন ঘরে ঢুকতে। বুবুকে তারা তাঁর হাতে থাকা গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে চলল। আমি তখন কী করব বুঝলাম না। তাদের পেছন-পেছন যেতে লাগলাম। দেখলাম, তাঁরা বুবুকে মাইক্রোবাসে চড়াল, গাড়িতে আরও কয়জন ছিল দেখলাম। গাড়ির কোনো নম্বর প্লেট নেই। ১৪ ও ১৫ তারিখ পুরো দিন বাড়িতে থেকে রাতে আমি সুমনকে নিয়ে বাংলামোটর চলে গেলাম। ১৬ এবং ১৭ তারিখ সুমন আমার কাছেই ছিল। ১৭ তারিখে সুমনকে সেজদার কাছে দিয়ে এলাম।

বাংলার এই সূর্য কন্যার লাশ পাওয়া যায় একাত্তরের ১৭ ডিসেম্বর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে। চোখে সেই গামছা, যা তিনি রান্না করার সময় ব্যবহার করেছিলেন। পায়ে সেই সাদা মোজা। চুলের একদিক দেখা যায়। তাঁকে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে এবং পরে গুলি করে হত্যা করা হয়।

"সেলিনা পারভীনের সেজভাই ১৭ ডিসেম্বর বিভিন্ন জনের কাছে খোঁজ পেয়ে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে গিয়ে পরিবারের কাউকে না দেখতে দিয়ে আজিমপুর গোরস্থানে তাঁকে দাফন করেন। কেননা, তিনি বলেছিলেন, 'এ লাশ দেখে সহ্য করার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই।'

এভাবেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ, একজন সম্ভাবনাময় সম্পাদক এবং সাহিত্যিকের জীবন। ছোট্ট সুমন হারাল তাঁর মাকে। নারী সমাজ হারাল একজন আদর্শ মানুষকে, আর তাঁর ভাই-বোনরা? তাঁরা হারাল তাঁদের অতি প্রিয়, অভিমানী, জেদি, বহু গুণে গুণান্বিতা ছুট্টুকে।

শহিদ ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরী

জন্ম : ৬ এপ্রিল, ১৯৩৫
শহিদ হওয়ার তারিখ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
জন্মস্থান : কলকাতা
মা : কানিজ ফাতেমা মাহমুদা
বাবা : ইমাম উদ্দিন চৌধুরী
অবস্থান : তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে সবার বড়
পারিবারিক নাম : ডোরা
পেশা : ডাক্তার
মৃত্যুর সময় বয়স : ৩৬ বছর
ঘাতকের পরিচয় : পাকিস্তানি পুলিশ

'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে'—এই গানটি ছিল শহিদ ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরীর অত্যন্ত প্রিয় গানগুলোর একটি। জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলো ঘনিয়ে আসবার আগেও গানটি শুনেছিলেন তিনি। ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন রেকর্ডটি প্লেয়ারে রেখেই। ইমামউদ্দিন চৌধুরী ও কানিজ ফাতেমা মাহমুদা দম্পতির ছয় ছেলে ও মেয়ের সন্তানের মধ্যে ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরী, সেই ছিলেন প্রথম সন্তান। তাঁর ডাকনাম ছিল ডোরা। জন্ম ১৯৩৫ সালের ৬ এপ্রিল কোলকাতায়, বৈঠকখানা রোডে, নানাবাড়িতে। ডোরা নামের কোঁকড়া চুলের মেয়েটি বড় হতে থাকে তাঁর আপন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই। পড়াশোনা শুরু করে কোলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে। সেখানে থেকেই স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম শেষে তিনি কলেজে ভর্তি হন। একই ইনস্টিটিউশন থেকে মেধার সঙ্গে পাস করেন ইন্টারমিডিয়েট। তখনও কিন্তু তাঁর সতের বছর পূর্ণ হয়নি। সে কারণে সে বছর তিনি ভালো রেজাল্ট করেও ভর্তি হতে পারেননি মেডিক্যাল কলেজে। এক বছর বি.এস.সি. পড়েন। তারপর তাঁর বয়স যখন ১৭ হলো, তখন তিনি ভর্তি হন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ অব ইন্ডিয়াতে। সেখান থেকেই মাত্র একুশ বছর বয়সেই গোল্ড মেডেল নিয়ে এম. বি. বি. এস. পাস করেন ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরী।

প্রথমে তাঁর চাকরি হয় ভারতের আসাম সরকারের অধীনে। কিন্তু বেশিদিন সেই চাকরি ভালো লাগেনি ডোরার। তাই আবার চাকরি বদল করে ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন ডা. জোহরা কাজীর সঙ্গে কাজ

করেন এবং পরবর্তীকালে ঢাকাস্থ স্টেট ব্যাংকের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে যোগ দেন।

১৯৬৮ সালে ডোরা বিয়ে করেন ইঞ্জিনিয়ার ড. আবুল বাশারকে। তাঁরা থাকতেন মিন্টু রোডের স্টেট ব্যাংক কোয়ার্টারে। ডোরার স্বামী ড. বাশার তখন আই.সি.আই.-এর জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সময়ের ব্যবধানে ডোরা যথারীতি মোনালিসা ও বেলোরোসা নামে ফুটফুটে সন্তানের মা হলেন। তারা দু'জনেই মায়ের মতো ডাক্তার হয়েছেন। বর্তমানে তারা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

ডা. আয়েশা বেদৌরা চৌধুরীর খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল তাঁর পরিবারের কেউই এখন বাংলাদেশে নেই। তাঁর স্মৃতিচারণ যতটুকু করা হয়েছে, সেটা করেছেন তাঁর খালা কানিজ ফাতেমা মোহসিনা। সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "দেশের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। আশপাশের সবাই মুক্তিযুদ্ধে। আমার দুই ছেলে হায়দার আকবর খান রনো এবং হায়দার আনোয়ার খান জুনো ১৯৭১ সালের প্রথম দিক থেকেই গভীরভাবে ব্যস্ত ছিলেন। মার্চের প্রথম থেকেই দেশ জুড়ে শুরু হয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। পঁচিশে মার্চ তারিখে আমার ছেলেরা মিটিং করে বাড়ি ফিরল। রাত যত গভীর হতে লাগল, ততই বাড়তে লাগল অস্ত্রের শব্দ। বাড়িতে ফোনের পর ফোন আসছে। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন। কিছু যে একটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছিল সবাই। আমার ছেলেদের গভীর জন্য দুশ্চিন্তায় ছিলেন আত্মীয়-স্বজনেরা। ওদের সঙ্গে দুই-একদিনের মধ্যেই যোগ দিল জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রুমি। ডোরা ছিল তখন ওর মাকে নিয়ে ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডের একটি বাড়িতে। ডোরার ভাই-বোনদের মধ্যে কেউই তখন দেশে ছিল না। বাড়িতে বসে আমরা তখন আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছি এবং দেখছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন। সে সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল খবর এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার অপরিমেয় শক্তির মূল উৎস। আমরা অপেক্ষায় থাকি কখন পাব আমাদের ছেলেদের যুদ্ধের খবর। কিন্তু ডোরা তাঁর স্বভাবের মতোই ধীরস্থির। কিন্তু সে আমাদের মতো অস্থিরতায় বসে সময় কাটায়নি। সে যোগাযোগ করতে শুরু করল আমার দুই ছেলের সঙ্গে। ও চেয়েছিল ওর অবস্থান থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু করতে। ফলে অচিরকালের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিতে শুরু করল। পাশাপাশি চলল তাঁদেরকে তাঁর সেবা করার পালা।

আমার ছোট ছেলে জুনো তখন ঢাকার অদূরে শিবপুর এলাকায় যুদ্ধরত। জুনো আমাদের বাসায় খুব কম আসলেও সে ডোরার সঙ্গে রাখত নিয়মিত যোগাযোগ। মাঝে-মধ্যে সে ডোরার বাসায় গিয়েও থাকত এবং বেশিরভাগ সময়ই যেত ওষুধপত্র আনতে। ডোরা চুপি চুপি অনেকের কাছ থেকে টাকা এবং ওষুধপত্র নিয়ে আসত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে।

এভাবেই চলল মাস কয়েক। আমি মাঝে মাঝে আমার ছেলেদের সংবাদ পাই ডোরার কাছ থেকেই। এভাবে আস্তে আস্তে ফুরাল আমাদের অপেক্ষার দিন ও রাতগুলো। অবশেষে এলো সেই জাতির জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ—১৬ ডিসেম্বর। আমাদের জন্য এই দিনটি যেমন আনন্দ তেমনি শোকেরও।

"১৬ ডিসেম্বরের দুই দিন আগে কারফিউ তুলে নেয়া হলো। ডোরা ১৫ তারিখে বিকেল বেলা এলো। বলল, 'খালা, দেশ মনে হয় খুব দ্রুতই স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে।' ১৬ ডিসেম্বর খুব সকালেই শুনতে পেলাম আত্মসমর্পণের খবর। ডোরা সকালেই ফোন করে বলল, 'খালা, দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল, চলেন একটু ঘুরে ঘুরে দেখি, কেমন হয়েছে পুরো ঢাকার চেহারা। টেলিফোন রাখার আধঘণ্টার মধ্যে ডোরা তাঁর দুই মেয়ে এবং মাসহ আমার বাসায় চলে আসে। আমি প্রথমে যেতে চাইনি। বলেছি, ডোরা, এত মানুষ কীভাবে একসঙ্গে একটিমাত্র গাড়িতে করে যাব? কিন্তু ডোরা জেদ ধরল। ডোরা ছিল আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান। তাই ডোরার সমস্ত আব্দার আমাদের কাছে ভিন্ন আবেদন তুলে ধরত। ডোরা বায়না করেছে আর তা হবে না, সেটা আমরা খুব একটা করতাম না।

তাই সেদিন ডোরার অদম্য ইচ্ছেতেই আমরা, মানে আমি, আমার স্বামী জনাব হাতেম আলী খান, পুত্রবধূ মাহবুবা রাশিদা চপল, আমার মা ও ডোরার ড্রাইভার মনির আহমেদ তাঁরই টয়েটা গাড়িতে করে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখব বলে রওয়ানা হলাম। একটু এগিয়ে যেতেই ডোরা হঠাৎ করেই বলল, "দেখেন খালা যাঁরা এই স্বাধীনতার জন্য জীবন দিল তাঁরা আজ এই স্বাধীনতা দেখে যেতে পারল না। তাঁরা আজ এই আনন্দ দেখতে পারছে না"। খুবই উচ্ছ্বসিত লাগছিল ডোরাকে।

গাড়ি আস্তে আস্তে ধানমন্ডি ১৮ নম্বরের যে বাড়িতে বেগম শেখ মুজিবুর রহমান তার দুই মেয়েসহ বন্দি ছিলেন সে বাড়ির দিকে যেতে লাগল। আমি গাড়িটি এই দিকে আসছে দেখেই ড্রাইভারকে নিষেধ করলাম। কিন্তু ডোরার মতো আনন্দে ড্রাইভারও বলে উঠল, "আজ কিছুই হবে না, আজ তো স্বাধীন।" কিন্তু গাড়িটি ঘুরতেই সে বাড়ির সামনে অবস্থানরত দখলদার বাহিনী আমাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিতে ডোরা এবং ড্রাইভার মনির আহমেদ সাথে সাথে মারা যান। শুনেছিলাম, ভেতরে থাকা অবস্থায় বন্দি বেগম মুজিব গাড়িতে আমাদের দেখতে পেয়ে উপরের টহলদার বাহিনীকে গুলি করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা ততক্ষণে গুলি করে ফেলেছিল। আমার হাতে এবং চপলের মাথার উপরের অংশে গুলি লাগে। ডোরার মাথাটা আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে ওর নানির কোলে।

আমি এবং পুত্রবধূ চপল ব্যান্ডেজ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। আমাদের অনেক ভালোবাসার ডোরা ফিরল লাশ হয়ে। ডোরার সেই দিনের কথা মনে হলে আজো আমার দু'চোখ ভিজে যায়। তারপর শহিদ ডোরার লাশ শোয়ানো হলো সেই আমার ৩২ নম্বর রোডের

বাড়ির বারান্দায়, যে বাড়ি থেকে ডোরা বেরিয়েছিল বিজয়ের আনন্দ দেখার জন্য। শহরে তখন ব্ল্যাক আউট শুরু হয়েছে।

ডোরার একটা পোষা কুকুর ছিল। ও সেই কুকুরটিকে ভালোবাসত সন্তানের মতো। ডোরার মৃত্যুর পর সেই কুকুরটি ডোরার মাথার পাশে বসে ছিল সারারাত। কুকুরটাকে কিছুতেই সরানো যায়নি তাঁর কাছ থেকে। প্রভুভক্ত কুকুর, ভেবেছে যতক্ষণ সামনে থাকতে পারবে, ততক্ষণই প্রভু তার চোখে চোখে থাকবে।

একটা দিন ডোরা শুয়ে থাকল আমার বাড়িতে। সেই ডোরার সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে পারিনি। ডোরা হাসেনি। নড়েনি। পরের দিন ১৭ ডিসেম্বর বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস সায়েম এবং মিসেস হাফিজ এলেন। ডোরাকে তারা গোসল করালেন। মাথায় গুলি লেগে ডোরার এক গাছি চুল উড়ে গিয়েছিল। সেটি আমি পরম মমতায় তুলে রাখলাম। অনেক পরে সেটি তাঁর মেয়েদের দিয়ে দেই।

ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে, ডোরার লাশ কবরস্থানে নেবার মতো খুব একটা মানুষ তখন কাছে ছিল না। অবশেষে গাড়ির ছাদের ওপর দড়ি দিয়ে বেঁধে ডোরাকে আজিমপুর গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ডোরা ঘুমিয়ে আছে সেখানেই। ওর প্রিয় সহকর্মী ড. জোহরা কাজী মাঝে মাঝে আমার সাথে দেখা হলেই বলতেন, "আমি আজিমপুর যতবার যাই, ততবারই ডোরার কবরটা দেখি।"

এতদিন পরেও ডোরা আমার কাছে আগের মতোই। তাঁর বিভিন্ন স্মৃতির মধ্য দিয়ে আমার কাছে এখনো আছে আমারই সুগভীর ভালোবাসার ডোরা।